Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য : বিভাগ-পূর্ব পর্ব

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শামীমা আক্তার
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.6
Pages	১৩৭-১৮২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য : বিভাগ-পূর্ব পর্ব

শামীমা আক্তার*

সারসংক্ষেপ : বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বনফুলের অবস্থান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। কল্লোলীয় হুজুগে সমর্পিত না হয়ে তিনি সহজ-সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে জীবন-অবলোকন ও বিশ্লেষণ করেছেন। কোনো ইজমের তিনি দ্বারস্থ হননি। কোনো আদর্শ প্রচারের বাহন হয়ে ওঠেনি তাঁর সাহিত্য। ভালো-মন্দ নির্বিশেষে মানুষই হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পভাবনার প্রধান বাহন। তাঁর কথাসাহিত্য শিল্পমানে ও পরিমাণে ঋদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যায়ে রচিত তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে বনফুল একজন স্বতন্ত্র ধারার লেখক– যেমন বিষয়নির্মাণে তেমনি চরিত্রগঠনে এবং রচনারীতিতে। যুদ্ধ-পরবর্তী অস্থির সময়পটে যাঁরা কল্লোলের ভাবধারায় সাহিত্যচর্চা করেছেন, বনফুল তাঁদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেছেন। তিনি হাসিকান্না-আনন্দবেদনা-মিশ্রিত মানবজীবনের সদর্থক প্রান্তকে তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের বিশেষ পরিচিতিই তাঁর ছোটগল্পের জন্য। তবে তাঁর উপন্যাসেরও যথেষ্ট ব্যাপ্তি রয়েছে। বনফুল নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনবলয় থেকে সরে এসে অবহেলিত নিগৃহীত মানুষের জীবনরূপকেই তাঁর ছোটগল্পের ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন। ওইসব নিগৃহীত মানুষকে তিনি চিত্রিত করেছেন যারা সকলের চোখের সামনে থেকেও একটি নির্দিষ্ট পরিচিতির অভাবে অবহেলিত, অনুচ্চারিত। আর এ কারণেই বনফুলকে ছোটগল্পের উপকরণ নির্বাচনে তেমন বেগ পেতে হয়নি (পবিত্র সরকার, ১৯৯৯ : ২০৫)।

বনফুলের বাবা সত্যচরণ একজন জনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন। পেশার সুবাদে এবং তাঁর চরিত্রমাধুর্যে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সমাগম ঘটত তাঁর বাড়িতে। বাড়িটি অনেক মানুষের আশ্রয়স্থলও ছিল। ফলে শৈশব থেকে বনফুল বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছেন। সাহিত্য সম্পর্কিত পত্রিকাসহ নানা রকম পত্রিকা রাখা

*প্রাক্তন প্রভাষক, ভাষা ইনস্টিটিউট, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হতো তাঁর বাড়িতে। তাছাড়া বনফুল বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করেছেন, সঙ্গত কারণেই মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর ব্যাপক ও গভীর। তিনি জীবনচলার দীর্ঘপথে যেসব মানুষের সঙ্গলাভ করেছেন, তাদেরই চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। ছোটগল্পে তিনি মানবমনের বিচিত্র লীলার একটি খণ্ডাংশের বা মুহূর্তের প্রতি আলোকপাত করে সমগ্রতার ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কখনো চরিত্রের, কখনো কাহিনির, কখনো ব্যঙ্গ ও কৌতুকের, আবার কখনো রূপক ও প্রতীকধর্মিতার।

বাংলা সাহিত্যে কেবল বনফুলের ছোটগল্পেই মানবজীবন ও চরিত্রের বিচিত্র রূপের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। সে দিক বিবেচনায় তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়েছে বহুমাত্রিক। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত বনফুলের ছয়টি গল্পগ্রন্থকে প্রথম দিকের গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সময়ের গল্পগ্রন্থগুলো যথাক্রমে – *বনফুলের গল্প* (১৯৩৬), *বনফুলের আরও গল্প* (১৯৩৮), *বাহুল্য* (১৯৪৩), *বিন্দু বিসর্গ* (১৯৪৪), *আরও কয়েকটি* (১৯৪৭) এবং *অদৃশ্যলোকে* (১৯৪৭)। তাঁর গল্পের বিষয়গুলোকে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত-জীবনআশ্রিত, চরিত্রপ্রধান, মনস্তত্ত্বমূলক, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসপ্রধান, সমাজ-সমস্যামূলক, পশুপ্রীতিমূলক, রূপক ও প্রতীকধর্মী, প্রেমাশ্রিত এবং অতিপ্রাকৃত পরিবেশের গল্প হিসেবে সরলীকরণ করা যায়। গল্পে তিনি কখনো মানবজীবনের প্রবহমান স্রোতধারার হালকা রূপ, কখনো জীবনের অকস্মাৎ স্ববিরোধিতার প্রকাশ, মনের গভীর দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রকাশ, আবার কখনো আত্মানুসন্ধানকে তুলে ধরেছেন।

প্রথমে মধ্যবিত্তের জীবনাশ্রিত গল্পের আলোচনায় 'চিত্রচতুষ্টয়' গল্পটির কথা ধরা যাক। গল্পটিতে লেখক চিত্রকর হরিচরণবাবুর চার ছেলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছেন। এর মধ্য দিয়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চার ছেলে বেচুবাবু, সতীশবাবু, যোগীনবাবু ও অতুলের একদিনের জীবনচিত্রকে লেখক উপস্থাপন করেছেন। বেচুবাবু চাকুরিজীবী; তার পরনে থাকে ফতুয়া, থান ও পুরানো কেড্‌স। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ; চোখে সুতো দিয়ে আটকানো নিকেলের ফ্রেমের চশমা; বয়সের ভারে দেহটি সামান্য হেলে পড়েছে। সকাল সাতটায় তিনি হেঁটে যান বাজারে। কাছের বাজার ছেড়ে দূরের বাজারে যান সের পিছু দুই পয়সা বাঁচানোর জন্য। সস্তায় জিনিস কেনা তাঁর কাছে রীতিমত গর্বেরও বিষয়। এ লক্ষ্যে তিনি কলকাতা শহরটাকে চষে ফেলতেও প্রস্তুত। ইতিহাসের গবেষক সতীশবাবু, গবেষণা-ঘটিত গুরুতর সমস্যার সমাধানকল্পে প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তার গায়ে থাকে লংক্লথের পাঞ্জাবি, বুকপকেটে ফাউন্টেন পেন এবং বগলে একটি খাতা। তিনিও বেচুবাবুর মতো পদব্রজে যান। আধ্যাত্মিক প্রকৃতির যোগীনবাবু একজন নিরামিষাশী। নাকে মাত্রাতিরিক্ত নস্য ঢুকিয়ে সোয়া সাতটায় তিনিও পদব্রজে বেরিয়ে পড়েন। তার উদ্দেশ্য হিমালয় থেকে কলকাতায় আগত ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসীর

সাক্ষাৎ লাভ। হাফ প্যান্ট, গেঞ্জি ও খালি পায়ে সিনেমার টিকিট কেনার উদ্দেশে অতুল চলেছেন দ্রুতগতিতে।

গল্পটিতে লেখক চিত্রকর হরিচরণবাবুর চার ছেলের চারটি পৃথক জীবনচিত্রকে চিত্রিত করেছেন, যা চিত্রকর হরিচরণবাবুর তুলিতে কখনো মূর্ত হয়ে ওঠেনি। গল্পটিতে আপাতদৃষ্টিতে ঐক্য যা আছে, তার চেয়ে অন্তরে আছে পার্থক্য।

'জৈবিক নিয়ম' গল্পটিতে লেখক উনিশ কুড়ি বছরের এক যুবকের যৌবনের মাত্রাতিরিক্ত কার্যকলাপের দিকটি তুলে ধরেছেন। যৌবনের ধর্মই যেন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো। স্টেশনের প্লাটফর্মে চারজন অপেক্ষমান, একজন উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক, দুজন সাঁওতাল এবং একজন কমবয়সী মেয়ে। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যুবকটির অনিয়ন্ত্রিত যৌবনাবেগ তাকে আত্মপ্রচারে অস্থির করে তোলে। সে কণ্ঠস্বর অকারণে অসম্ভব করে কুলিকে ডাকে, ট্রেনের বিলম্ব দেখে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করে, মেয়েটি চানাচুর খরিদ করছে দেখে যুবকটি এক টাকার বিনিময়ে সব চানাচুর খরিদ করে পাশের বেঞ্চিটার উপর রেখে দেয়। যুবকটির এতো সব কার্যকলাপে মেয়েটি কিন্তু পূর্ববৎ স্বাভাবিকই থাকে। এবার যুবকটির চঞ্চলতা আরো বেড়ে যায়। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে তার সামনে দিয়ে পায়চারি শুরু করে দেয়। কখনও পেশি ফুলায় আবার কৃষ্ণচূড়ার ডাল ধরে ফুল পাড়ার চেষ্টা করে। ঠিক এই সময় ট্রেন আসে। ট্রেনের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির বাহাদুরির গতিটাও বেড়ে যায়। সহাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পা ফসকে চাকার নিচে পড়ে যায় যুবকটি।

গল্পের শেষে অসঙ্গতি-ভরা যৌবনকে নিয়ে পরিহাস থাকলেও যৌবনের তেজোদ্দীপ্ত প্রাণধর্মের প্রতি বনফুলের আকর্ষণ বরাবরই লক্ষণীয়। তাই গল্পের মর্মান্তিক পরিণামটি লঘু-কৌতুক-রসের পাশাপাশি লেখকের সমবেদনায়ও একীভূত হয়ে আছে।

সময়ের পরম্পরায় বনফুল লক্ষ করেছিলেন এক বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যহীন মানসিকতার (ঊর্মি নন্দী, ১৯৯৭, ৭৭)। জীবনের এই বিপর্যস্ত দিকটি তাঁর 'আকাশ-পাতাল' গল্পটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পের নায়ক চাকরিজীবী, বেতন পঁয়ত্রিশ টাকা। বেকার অবস্থায় বিয়ে করেন সুরমা নামের এক তরুণীকে। যার হাসিতে মানিক এবং কান্নায় মুক্তা ঝরে। সুরমা ছিল বিলাসী প্রকৃতির। যদিও সুরমার গায়ের রং নিয়ে আত্মীয়মহল অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। সুরমার সব ধরনের শখ মিটাবার জন্য তার স্বামী সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। এভাবে তাদের দিন কাটছিল। একদিন অঘটন ঘটল তাদের ধনী প্রতিবেশীটিকে নিয়ে। প্রতিবেশী বধূটি ছিল সুরমার বাল্যসখী। একবার সুরমা তার স্বামীকে রাজি করিয়ে সাতদিনের জন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে মোটরে করে মধুপুরে বেড়াতে যায়। বাড়িতে ফিরে জানতে পায় তার স্বামী

এক্সিডেন্ট করেছে, হাসপাতালে আছে। স্বামী একটি পত্র রেখে গেছে– 'আমি তোমার অনুপযুক্ত। তোমাকে লুকাইয়া একটি আড়াই হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছিলাম। টাকাটা তুমিই পাইবে। তাহা দিয়া একখানা মোটর কিনিও – ইহাই আমার শেষ অনুরোধ' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫, ৩০৯)। পত্রটি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় সে, দুঃখে সুরমা আত্মহত্যা করে। আর তার স্বামী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বিগতনাসা হয়ে গলায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাস্তায় সুরমা শাড়ির বিজ্ঞাপন করে দিনাতিপাত করে সে। লেখক গল্পটিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কর্তার দারিদ্র-জর্জরিত অসহায় অবস্থাটি তুলে ধরেছেন। স্বামীর প্রতি সুরমার ভালোবাসা অর্থের নিষ্পেষণে চাপা পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। লেখক সুরমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত নারী চরিত্রের একটি বাস্তব চিত্র অংকন করেছেন।

জীবনচলার পথে মানুষকে বিভিন্ন দায়বদ্ধতা মেনে নিতে হয়। হাসির গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিহরবাবু যে প্রতিকূল পরিবেশে 'হাসির গল্প' লিখতে বসেন তা সম্পূর্ণই পাঠকের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে। গল্প লেখার পরিবেশটি ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকূল– একদিকে গৃহকর্ত্রীর কড়া মেজাজ, বায়না মিটাতে এক শিশুর অনবরত চিৎকার, ১০৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা ও প্রচণ্ড মাথাব্যথায় আরেক শিশুর বমি করা, অবিরত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ। বিরূপ প্রতিবেশের মধ্যে দুয়ারে কড়কড় কড়ার শব্দ বেজে ওঠে। হরিহরবাবু বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে বিল নিতে আসা মুদিকে বলেন, 'পরশু দেব, আজ হাতে কিছু নেই। কটূক্তি করিয়া লোকটা চলিয়া গেল' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩২০)। এদিকে হরিহরবাবু ফুটবাথ নিচ্ছেন। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় তিনি বাম হাতে রগ দুটি টিপে ধরে ভাবছেন। আজই তাঁকে একটি হাসির গল্প লিখে দিতে হবে। গল্পটিতে বিরুদ্ধ প্রতিবেশে হরিহরবাবুর গল্প লেখার বাধ্যবাধকতায় একদিনের খণ্ড জীবনের মধ্যেই যেন তাঁর অখণ্ড জীবনকে পাঠকের সামনে আনা হয়েছে।

কালান্তরের পরিবর্তনকে মেনে নিয়েই বনফুল মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তিজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে সন্দেহপ্রবণতা মধ্যবিত্ত মানসিকতার একটি চারিত্রিক লক্ষণ। 'ব্যতিক্রম' গল্পটিতে এ বিষয়টির প্রতিরূপ লক্ষ করা যায়। গল্পের নায়ক সুরেন সুদর্শন পুরুষ, পশ্চিমের শহরে গঙ্গার ধারে তাঁর বাসা। পিতামাতাহীন সুরেনের সঙ্গে থাকে সহকারী হকবু ও একটি বাইক। আজকালকার মেয়েদের প্রতি তার কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নেই, বরং রয়েছে ভয়। কিছুদিন আগে তিনি খবর পেয়েছেন, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বিএ পাস স্ত্রী ভ্যানিটি-ব্যাগটি সম্বল করে এক আর্টিস্টের সঙ্গে চলে গেছে। একদিন সুরেনের বাসায় সেই ললিতের স্ত্রী আভা দেবী এসে হাজির – যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। প্রত্যহ সে আসে এবং তার আগমনের কারণটি অনুক্ত রেখে গল্প করে চলে যায়। এখানকার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছে আভা দেবী। এভাবে মাস দুয়েক

কাটার পর কিছুদিন আভা দেবী সুরেনের বাসায় যাতায়াত বন্ধ রাখে। এরইমধ্যে আভা দেবীর প্রতি সুরেনের দুর্বলতা জন্মে যায়। সুরেন নিত্যদিন তার অপেক্ষায় থাকে। এ অবস্থায় আচমকা একদিন স্কুলের সেক্রেটারি মুরারিমোহন পুরকায়স্থ সুরেনের বাসায় এসে হাজির হলো। তিনি সুরেনকে জানালেন, তার বাসায় আভা দেবীর আগমন এবং তার সঙ্গে গল্প করার বিষয়টি শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই বিষয়টির নিন্দা জানাচ্ছে। পরদিন সুরেন আভা দেবীকে উদ্দেশ্যে করে দীর্ঘ এক পত্র লেখে। পত্রটি খামে পোরামাত্রই আভা দেবীর হঠাৎ আগমন ঘটে। সে সুরেনের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে। এ সময় সুরেনকে বলা আভা দেবীর নিম্নোক্ত কথাগুলোর মধ্যেই রয়েছে গল্পের সারমর্ম :

> ...ওঁর চিঠি পেয়েছি, উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিঠি লিখেছেন ফিরে যেতে। আমিও কিছুদিন চাকরি করে বুঝেছি, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া আমাদের আর কোনো সত্য আশ্রয় নেই। যেখানেই যাই, নানা ছুতোয় এক ঝাঁক পুরুষ পেছু নেবে... এখানে মুরারিবাবু তো আছেনই। আরও আছেন কয়েকজন ভদ্রলোক, নাম আর করব না। আভা দেবী চুপ করিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। চিঠি লিখে বিরক্ত করেননি' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩২৭)।

ফলে সুরেনের পত্রটি আর দেওয়া হলো না। গল্পটিতে লেখক শিক্ষিত ও রূপসী নারীর অসহায়ত্বের পাশাপাশি নারীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির দিকটি (সুরেনের মাধ্যমে) উন্মোচন করেছেন। স্বামীর গৃহে আভা দেবীর প্রত্যাবর্তন সামাজিকভাবে অবহেলিত নারী সমাজেরই রূপায়ণ। আর মুরারিমোহন বাবুর মতো লোকেরা নিজেদের অপবাদ অন্যের স্কন্ধে দিয়ে সমাজটাকে যে কলুষিত করছে সে দিকটিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি।

'প্রভু-ভৃত্য' গল্পটিকে লেখক প্রভু ও ভৃত্যের সুপ্ত বাসনা পূরণ এবং সময় ও সুযোগের যথাযথ ব্যবহারকেই উপস্থাপন করেছেন। মানুষ যেন সর্বক্ষণ তার মনোবাসনা পূরণের জন্য মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় থাকে। আর যখন সে প্রতীক্ষিত সময়ের আবির্ভাব ঘটে তখন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তা পূরণে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। 'প্রভু-ভৃত্য' গল্পটিতে লেখক প্রভু ও ভৃত্যের জীবনের এদিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। প্রোষিতপত্নীক ভৃত্য প্রোষিতপত্নীক প্রভুর পাহারা দিচ্ছে। কিছুদিনের জন্য বেড়াতে প্রভুর গৃহিণী বাবার বাড়িতে গেছেন। বাড়িতে অরিন্দম নামের এক ভৃত্যকে রেখে গেছেন স্বামীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য। অরিন্দম প্রভুর তত্ত্বাবধানে এতটাই নিবিষ্ট যে প্রভু রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কারণ তিনি এ-সুযোগে হাসপাতালের নার্স রুবিকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন বলে মনস্থির করে রেখেছেন। ভৃত্য অরিন্দমের অতিরিক্ত নজরদারির কারণে কোনোভাবেই যেন তিনি সুযোগ করে উঠতে পারছেন না; স্বস্তি পাচ্ছেন না। কিন্তু এক সময় অরিন্দমই প্রথম এ সুযোগটা

লুফে নিলো। সে বুদ্ধি করে বুড়ো গোয়ালাটিকে তাড়িয়ে দিয়ে তার পছন্দের কমবয়সী এক গোয়ালিনী নিযুক্ত করলো। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে প্রভুর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হলো। এবার তিনি ভৃত্যকে আদেশ করলেন– 'দুধ একটু বেশী নে আজ। পুডিং বানাতে হবে। হাসপাতালের নার্স রুবি আজ খাবে রাত্রে এখানে। সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে অরিন্দম বলিল, যে আজ্ঞে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩২৯)। প্রভু ও ভৃত্য দুজনের গৃহিণীই পিত্রালয়ে, এ সুযোগে দুজনেই অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মানবমন কখনো শাসনের অধীন নয়। অনুকূল পরিবেশে সে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কড়া নজরদারির মধ্যে থেকেও প্রভু তাঁর বাড়িতে নার্সকে আমন্ত্রণ করলেন, গৃহিণী থাকাবস্থায় যা ছিল অসম্ভব। গল্পটি উত্তম পুরুষের ভাষ্যে রচিত। প্রভু এখানে কথক।

'বুর্জোয়া-প্রলিটারিয়েট' গল্পটিতে হলধর মহাশয় তাঁর চতুর্থ কন্যার বিয়ের ভোজের খরচ কমাতে গিয়ে যে কৌশলের আশ্রয় নিলেন, তা যেমন মানহানিকর তেমনি বেদনাদায়ক। হলধর মহাশয় চিন্তায় পড়ে গেলেন কী করে বিয়ের ফর্দ থেকে কিছু খরচ কমানো যায়। এসময় নিধি গোয়ালা দধির বায়না নিতে এলে তাকে দেখে হালদার মহাশয়ের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। তিনি নিধিরামকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দধিটি দিতে বললেন পাঁচ টাকা মণের। এ বিষয়ে তাদের কথোপকথন : 'বলছি নিন্দে-টিন্দে যদি কেউ করে তখন তোমাকে ডেকে আমি একটু ধমক টমক দেবো। ভাবটা যেন তোমাকে আমি ভাল দই-ই দিতে বলেছিলাম তুমি যেন আমাকে ঠকিয়েছ। তুমি একটু কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো বাস্ আর কিছু করতে হবে না। ...আমায় উদ্ধার করো তুমি, ভাল দই কেনবার আমার পয়সা নেই। অথচ মানটা বাঁচাতে হবে– দ্বিধাগ্রস্ত নিধিরাম অবশেষে রাজি হইয়া গেল' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৩৩)। পাতে দই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে যথাসময়ে নিধিরামকে ডাকা হলো। কিন্তু সহসা হালদারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল; নিধিরাম তাঁকে ঠকিয়েছে, মিথ্যা কথা বলেছে– এই বলে সে আবেগের আতিশয্যে নিধিরামের গালে চপেটাঘাত করলো এবং জুয়াচোর, পাজি কোথাকার বলে গাল দিল। নিধিরাম সহ্য করতে না পেরে সত্য প্রকাশ করে দিল– 'চড় মারবার তো কথা ছিল না। চড় মারলেন যে বড়! আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক রয়েছেন, বিচার করুন আপনারা–' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৩৩)। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হালদার প্রাণপণে নিধিরামের মুখ চেপে ধরলেন।

জীবনে চলার পথে মানুষকে কখনো কখনো নিজের মতের চরম বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। প্রয়োজনে তখন সে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেও পিছপা হয় না। লেখক 'মাধব মুকুজ্যে' গল্পে এ বিষয়টির উপস্থাপন করেছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি মুকুজ্যের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অমাবস্যার রাত্রি। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার; রাত্রি দশটা। মাধব মুকুজ্যে ক্লাবঘর থেকে বাড়ি ফিরছেন, পথে প্রতিবেশী চাটুজ্যের সঙ্গে

দেখা। চাটুজ্যের হাতে লণ্ঠন। মুকুজ্যে শুরুতেই চাটুজ্যের মেয়ের বিয়ের খবরাখবর জানতে চাইলেন। চাটুজ্যে বললেন, বিনাপণে কোনো সুপাত্রই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না, অথচ তাঁর মেয়ে কিছু নিন্দের নয় – গুণবতী মেয়ে। সাড়ে তিন হাজারের কমে কোনো ব্যাটাই রাজি নয়। এই বলে চাটুজ্যে সমাজকে দোষারোপ করেন। প্রতিবাদে মুকুজ্যে বলেন, দোষ সমাজের নয়; দোষ চাটুজ্যের, কারণ তিনি অসমর্থ। চাটুজ্যের অসামর্থ্যের পেছনে অনেক যুক্তি দাঁড় করালেন মুকুজ্যে। এক পর্যায়ে কথার পরম্পরায় চাটুজ্যে তাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে মুকুজ্যের সঙ্গে চলতে লাগলেন। লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান সমস্যা – মেয়ে পাত্রস্থ করতে না পারার সমস্যাকে মুকুজ্যে এবং চাটুজ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মেয়েকে সুপাত্রস্থ করতে না পারার কারণ একটার পর একটা ব্যাখ্যা করিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষকে (চাটুজ্যে) দিয়ে প্রতিটা যুক্তি খণ্ডন করিয়েছেন। তর্ককে প্রলম্বিত করতে বিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপনই যথার্থ কারণ ছিল। আর এটা মুকুজ্যে করেছেন চাটুজ্যে মশায়ের হাতে লণ্ঠন থাকার কারণে। মুকুজ্যে আজ টর্চটা আনতে ভুলে গিয়েছেন। পণপ্রথাটা তার কাছে অতিশয় খারাপ। 'আজ ভীষণ অন্ধকার' – উক্তিটির মধ্যে দিয়ে লেখক মুকুজ্যের মানসিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। মুকুজ্যের ঘরেও চার-চারটি বিবাহযোগ্য মেয়ে। অথচ সামান্য প্রয়োজনের তাগিদে মুকুজ্যে পণপ্রথার পক্ষে কত যুক্তিই না খণ্ডন করলেন!

'ঘোষাল মহাশয়' গল্পটিতে মধ্যবিত্ত পরিবারে নববধূর মাংস রান্নাকে কেন্দ্র করে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে যে-গুঞ্জন ওঠে তা কীভাবে ব্যক্তি-পরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করে সে দিকটি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ির প্রথম নববধূ সবিতা। কলেজে পড়া বউ এ গ্রামে প্রথম। তাই সবার আশঙ্কা ছিল সবিতার ধরন-ধারণ হবে আধুনিক গোছের হাল ফ্যাশনের মেয়েদের মতো। কিন্তু সবিতাকে দেখে সবার দুর্ভাবনা ঘুচে গেছে। কারণ শান্তশিষ্ট মিশুক সবিতার কোনোরূপ বদ চাল নেই। ঘোষালের ছোট ছেলে বীরেন তাদের ক্লাবের 'ফিস্ট্'-উপলক্ষে মাংস রেঁধে দিতে সবিতাকেই প্ররোচিত করল। বলল– 'বৌদি মান রাখতে হবে কিন্তু'। ঘোষাল মহাশয় কৌতূহলবশত বারবার মাংস রান্নার খবর নিতে গিয়ে জানলেন তাদের বউ মাংস পুড়িয়ে ফেলেছে। তিনি হেসে গিন্নিকে বলেন– 'হাজার হোক ছেলেমানুষ তো, এখন কি আর অত হুঁস আছে, করতে করতেই হবে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৫৫)। আর মেয়ে পুষিকে নিষেধ করে বললেন– 'পাড়ায় পাড়ায় ঢাক পিটিয়ে বেড়াস না যে কলেজে-পড়া বৌদি মাংস রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল। তোর পেটেতো কথা থাকা মুশকিল।... খবরদার একটি কথা কারো কাছে বলবে না। আর কেউ শুনেছে না কি?... বিন্দি ঝিটা শুনেছে... কোথা সে, মানা করে দাও তাকে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৫৬)। পরদিন খবর গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেলো, নববধূ মাংস রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে একাকার করে ফেলেছে। বীরেনের তদন্ত সাপেক্ষে

জানা গেলো– স্বয়ং ঘোষাল মশায়ই খবরটি প্রথম বাঁড়ুয্যের কানে দেন, বাঁড়ুয্য দত্তকে, দত্ত চাটুজ্যেকে, চাটুজ্যে তার গিন্নিকে, সে মুকুজ্যের গিন্নিকে, মুকুজ্যে গিন্নির কাছ থেকে শুনেছে রাঙী নাপ্‌তানীটা– যে পুষিকে আলতা পরাতে এসে বলেছে, খবরটি সে মুকুজ্যে গিন্নির কাছ থেকে শুনেছে। ঘোষাল মহাশয়ই বীরেনকে বলেছিলেন সবিতাকে দিয়ে মাংস রান্না করাতে। ঘোষালের উদ্দেশ্য ছিল নতুন বউ যা রান্না করবে তাই একটি রসালো গল্প হবে এবং ঘটলও তাই।

'আইন'–গল্পের বিষয়টি হলো বিবেকবর্জিত এক ডাক্তারের অর্থলোলুপতার বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত। জীবন নামের এক যুবক ট্রেন থেকে নেমে সরাসরি ডাক্তার টি সি পালের কাছে এসেছে। কারণ তার ব্যাকডেটের সার্টিফিকেট লাগবে, সে ট্রেনের ভিতর এক যুবককে খুন করে এসেছে। প্রথম দিকে রাজি না হলেও মোটা অঙ্কের ফি অফার করায় ডাক্তার শেষে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি জীবনের অ্যাপেনডিক্সটাই অপারেশন করে দিলেন। হেসে বললেন– 'এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৫৮)। জীবন সার্টিফিকেট নিয়ে চলে গেলো। ঠিক এ সময় পিওন এসে ডাক্তারকে একটি চিঠি দিলো। চিঠি পড়ে ডাক্তার জানলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশকে খুন করে তাঁর কাছ থেকে এইমাত্র জীবন ব্যাকডেটের সার্টিফিকেট নিয়ে পালিয়ে গেছে। কেবল টাকার বিনিময়ে পুত্রের হত্যাকারীর সকল প্রমাণ লোপ করে দিলেন ডাক্তার নিজ হাতে। গল্পটিতে বিপন্ন সমাজজীবনের বীভৎস পরিণামকে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে তুলে ধরে একটি চূড়ান্ত মুহূর্তের তথ্যটুকু বনফুল পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। অনুভবের এই নির্বাক উপস্থাপনাই বনফুলের গল্পসাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র (ঊর্মী নন্দী, ১৯৯৭ : ১০৮)।

১৯৪৭ সালে নাটক '*কঞ্চি*' এবং গল্প সংকলন '*আরও কয়েকটি*' নামে বনফুলের দুটি বই প্রকাশিত হয়। এ সময়ের মধ্যে বনফুল দেশের রাজনীতি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। কংগ্রেসভক্ত বনফুলের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে দেয়ার পর থেকে এই দলটির প্রতি তাঁর মোহ ভেঙে যায়। একদিকে তিনি গুপ্তহত্যা চালানো বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, অপরদিকে নিজের দেশের লোকদের যারা ধরিয়ে দিচ্ছে তাদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা পোষণ করেছেন। তাছাড়া Quit India শ্লোগানে ভারতবর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত সহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বীরদের প্রতি বনফুলের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। অপরপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার মিত্রপক্ষের কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানো, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি পদে বাধা দেওয়া ইত্যাদি কারণে বনফুলের মনে তাদের সম্পর্কে একটা মানসিক বাধারও সৃষ্টি হয়। বনফুলের পরবর্তীকালের বহু গল্প উপন্যাসে তাঁর এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় (পবিত্র সরকার, ১৯৯৯ : ৮৬)।

মধ্যবিত্ত বাস্তববাদী আর আদর্শবাদীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে আদর্শবাদীকে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মধ্যবিত্ত আদর্শবাদীদের সংকট আরো প্রবল হয় (নিশীথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৮ : ১৭২)। 'নমুনা' গল্পে এই আদর্শবাদীর প্রতীক শিক্ষক বিনোদ নিজের বিশ্বাস, প্রাচীন মূল্যবোধকে প্রাণপণে রক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত, কমিউনিস্টদের তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট, যুদ্ধে ইতালির আত্মসমর্পণ মধ্যবিত্ত জীবনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিনোদের ছেলে শিবু আর সবিতার জেল হয়েছে, মেয়ে অমিতা চালের জন্য নীতি বিসর্জন দিয়েছে– এ অবস্থায়ও শিক্ষক বিনোদ তার আদর্শে অটল থেকেছেন। ঠিক এ সময় রামকৃষ্ণ, খ্রিস্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য– মহাপুরুষদের বাণী বিনোদের মনে বলসঞ্চার করে। কিন্তু ছেলে জীবুর আত্মহত্যার পর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তাঁর মনে জাগে সংশয় জিজ্ঞাসা– 'এসব সত্ত্বেও কি ভালোবাসা যায়, মায়া বলে সব উড়িয়ে দেওয়া যায়, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ভগবান আমাকে নির্মল করে তুলেছেন–এ কবিত্বে কি মন ভরে সত্যি? জবাব দাও, (হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে) জবাব দাও, জবাব দাও' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৮৭)।

বিনোদ মাস্টার একজন মূল্যবোধসম্পন্ন দৃঢ় নীতিবাগীশ। তিন দিন উপোস থাকার পরও তাঁর বাসায় বন্ধু রমেশের মজুত থাকা পঞ্চাশ বস্তা চালে তিনি হাত দেননি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের স্বপ্নের বাণী শুনে হতাশা লাঘব করা – সবকিছুতেই তিনি অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দেন; সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করেন। পরিশেষে ছেলের আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে বিনোদ মাস্টারের মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটেছে। তাঁর মনে হয়েছে– দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ভগবান মানুষকে নির্মল করে– কবিত্ব ছাড়া এ আর কিছুই নয়। বনফুলের মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর বাস্তবতায় মনে হয় তিনি নিজেই এসব চরিত্রচিত্রণের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

'নিস্তারিণী' গল্পটিতে স্টেশন মাস্টারের নীতিবোধ এবং দেবীর প্রতি মানত করে তাতে আস্থা না রাখতে পারার বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পটি উত্তমপুরুষের ভাষ্যে রচিত। স্টেশনমাস্টার কথক ডাক্তারবাবুর কাছে এসে তার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা বলে একটি 'সিক সার্টিফিকেট' চান। কারণ বেগমপুরে তার বদলির অর্ডার এসেছে। সে জায়গাটি ম্যালেরিয়ার ডিপো। কোনোরকমে দুটো মাস যদি কাটিয়ে দেয়া যায় তবে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দুমাস পর তাঁর পরিচিত চাটুজ্যে মশাই জয়েন করবেন, তখন তাঁর বদলির সমস্যা চুকে যাবে। কিন্তু ডাক্তার মিথ্যা সার্টিফিকেট দিতে নারাজ। তিনি নিস্তারিণী দেবীর কাছে মানত করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মাসখানেক আগে এ কাজটি মাস্টারমহাশয় সেরে নিয়েছেন, কোনো ফল হয়নি। কয়েকদিন পর তিনি আবার এসেছেন। এসেছেন প্রমাণসহ। তাঁর আসন্নপ্রসবা এক শালি এসেছে তাঁর বাড়িতে। যখন তখন হয়-হয় অবস্থা, তাকে স্ত্রী

বলে দরখাস্ত করবেন। ডাক্তারবাবু যে মাত্র সার্টিফিকেটখানা লিখতে শুরু করলেন অমনি খবর এলো শালির ছেলে হয়ে গেছে। মাস্টারমহাশয় হতাশ! একের পর এক নিস্তারিণী দেবীর কাছে মানত এবং ব্যর্থতার কথা তিনি বলে যাচ্ছেন। দুদিন পর তৃতীয়বারের মতো তিনি ডাক্তারবাবুর কাছে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন–

> আগস্ট ডিস্টারবেনসের ঢেউ এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দুদিকের লাইন সাফ। পুলটা পর্যন্ত ভেঙেছে। দুটি মাস এখন কোথাও নড়বার চড়বার উপায় নেই। তারপর আমার চাটুজ্যে মশাই এসে যাবেন–' 'কিন্তু নিস্তারিণীর ব্যবহারটা শুনবেন? উইল ইউ বিলিভ, নগদ পাঁচটি টাকা সিন্নি মানতে হয়েছে। এ যে দারোগা বেহন্দ হয়ে উঠলো একেবারে– ছি–ছি- (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৯৭)।

স্টেশনমাস্টার নিজের বদলি ঠেকানোর জন্য বারবার ডাক্তার এবং নিস্তারিণী দেবীর দ্বারস্থ হচ্ছেন, আর বারবারই ব্যর্থ হচ্ছেন। একবারের জন্য হলেও তিনি বেগমপুরে যাবার কথা ভাবলেন না। শেষ পর্যন্ত অগাস্ট ডিসটার্বেন্সের কারণে তাঁর দুমাস কোথাও নড়চড় করার উপায় রইল না। তবে তিনি অবাক হলেন শেষবার নিস্তারিণীকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত মানত করতে হলো!

হাসপাতালের পাশাপাশি কটেজে দুই টাইফয়েড রোগীর অবস্থান ও তাদের ভিন্নধর্মী আচার ব্যবহার ডাক্তারের মনে কতটা রেখাপাত করে তার-ই সংক্ষিপ্তসার 'অভিজ্ঞতা' গল্পটি। গল্পটি উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত। এক রোগীর বাবা ডাক্তার; নিকটবর্তী শহরে প্র্যাকটিস করেন। তাঁর ছেলে এখানকার হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে। ছেলেটির জ্বর হলে অন্যত্র নেয়া বিপজ্জনক বলে তিনি ডাক্তারের (কথকের) পরামর্শে তাকে হাসপাতালে এনেছেন। তিনি ডাক্তার বিধায় সর্বদাই ডাক্তারের (কথক) খুঁত ধরার জন্য উদ্যত থাকেন। কলকাতায় না গিয়েও তিনি সেখানকার প্রায় সব সরঞ্জাম বিভিন্ন উপায়ে জোগাড় করেন। কলকাতার দু'চারজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশও পত্রযোগে আনান। দিনে অন্তত দশবার তাঁর ছেলেকে ডাক্তার দিয়ে দেখান। এদিকে অপর রোগীটির বাবা এ অঞ্চলে আগন্তুক। তিনি একমাত্র ছেলের চাকুরির ছুতায় এখানকার ধর্মশালায় ওঠেন। তিনি ডাক্তারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। দুই রোগীর টাইফয়েডের প্রতাপ অনিবার্য গতিতে চলছে। এক গভীর রাতে ডাক্তারের ছেলের হেমারেজ শুরু হলো। ডাক্তার এলেন এবং জানতে পারলেন তাঁর আসার আগেই রোগীর ডাক্তার বাবা তার ওপর চিকিৎসা চালিয়েছেন। রোগীর অবস্থা বেগতিক দেখে গভীর রাতে মোটরবাইক নিয়ে কংগো রেডের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার বাবা। মৃত্যুর সময় ছেলের সঙ্গে দেখা হলো না তাঁর। ছেলের মৃত্যুর জন্য তিনি ডাক্তারকে দায়ী করলেন। দুদিন পর দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির শ্বাস ওঠে। এ সময় বৃদ্ধবাবা গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করে ছেলেকে শোনান। আর ডাক্তারকে বলেন– 'ইতস্ততঃ করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ আপনার পদধূলিই তো দরকার এ সময়ে। নিন...জুতো খুলুন... দিন ...বেশ ভাল করে মাখিয়ে দিন ওর

সমস্ত মাথায়...আসুন...' । পরে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন– 'কাঁদবার সময় অনেক পাবে । এখন নাম শোনাও । ছেলে যাচ্ছে ওর পাথেয় দিয়ে দাও...' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪০০) । পরদিন বৃদ্ধটি যাবার সময় হাসপাতালে একহাজার টাকার একটি চেক দান করে যান । চেকটা ভাঙাতে গিয়ে ডাক্তার লক্ষ করলেন বৃদ্ধটি একজন বিলাতি ডিগ্রিধারী রিটায়ার্ড সার্জন । গল্পটিতে দুই ডাক্তারের ব্যবহার ও কার্যকলাপের বৈসাদৃশ্যের দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে ।

'অশ্রুর উৎস' গল্পের রাজনীতিক দুই বন্ধু নিমাই এবং গণেশ । তাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া । তারা ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করতে চায় । তাদের বিশ্বাস– ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস না করলে মুক্তি নেই । চিরঞ্জীব প্রসাদের সিন্দুক থেকে টাকা সরানোর জন্য তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা-অনুযায়ী দুটি নকল চাবি বানায় । যাত্রাভিনেতা নিমাই রিস্ক নেবার আগে তার বন্ধু গণেশের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে চায় । রাত ১২ টায় পুলিশের ড্রেস পরে ছদ্মবেশী নিমাই গণেশের বাসায় প্রবেশ করে । এ সময় গণেশকে চিরঞ্জীবের টাকা সরানোর ঘটনা এবং এ ঘটনায় কারা জড়িত আছে সে বিষয়ে সে জানতে চায় । এতে গণেশ ভয় পেয়ে যায় এবং বন্ধু নিমাইয়ের জড়িত থাকার বিষয়টি ছদ্মবেশী নিমাইকে বলে দেয় । ফলে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় । গল্পটিতে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর বিশ্বাস কতটা ঠুনকো সে দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, যা মধ্যবিত্ত জীবন-মানসের একপ্রান্ত ।

'গণেশ' গল্পটি সাংসারিক আর্থিক অনটনের চিত্র । সংসারে সুখ রয়েছে কিন্তু অর্থসংকট প্রকট । একটি সোনার হাত-বালাকে কেন্দ্র করে গল্পের শুরু ও পরিণতি । অল্প বয়সেই গণেশের শরীরে অতিরিক্ত ব্লাড প্রেশার দেখা দিয়েছে । পাশের গ্রামের আঢ্যিদের কাপড়ের দোকানে দশ টাকা বেতনে সে দৈনিক ১৫/১৬ ঘণ্টা কাজ করে । একবার তার চিকিৎসার জন্য স্ত্রী বিভাবতীর শখের বালা জোড়া বিক্রি করতে হয়েছিল । এরপর থেকে বিভাবতী প্রায়ই বিভিন্ন ছুতায় বালাজোড়ার প্রসঙ্গ তুলতো । একপর্যায়ে গণেশ রাতে স্বপ্নই দেখে ফেলল, সে বিভাবতীকে তার মনমতো শিমুলকাঁটার প্যাটার্নে বালা গড়িয়ে দিয়েছে । গণেশ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । কিন্তু বিষয়টি জটিলতর হয় বিভাবতীর দাদা ছোট বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলে । নিমন্ত্রণ রক্ষায় এবার বিভাবতীর বাবার বাড়িতে যাওয়া হলো না বালার কারণে । মাসখানেক পর সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে শিমুলকাঁটা প্যাটার্নের বালা এনে গণেশকে দেখিয়ে বলে– 'তোমাকে দেখাতে এনেছি । আমাদের দুজনের হাতের মাপও এক, এই দেখ, আশ্চর্য কিন্তু । বিভাবতী বালা দুটি পরিয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিল, বিস্ফারিতচক্ষে গণেশ দেখিতে লাগিল' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ২৮১) । পরদিন গণেশ দোকানে কাজ করছিল; তখন আঢ্যি বিধু স্যাকরাকে তার পুত্রবধূর জন্য শিমুলকাঁটা প্যাটার্নের একজোড়া বালা গড়াতে দিলো । কিছুদিন পর গর্বের সঙ্গে সেই বালা জোড়া গণেশ দিগম্বর আঢ্যির নাম করে এনে

বিভাবতীকে দিল। শেষে ঘুমের মধ্যে বালার কাঁটার আঘাতে গণেশের মৃত্যু হলো। গল্পের কাহিনীর পরিণামটি হৃদয়বিদারক।

মানবজীবনে এমন মুহূর্তেরও আবির্ভাব ঘটে যা তার বিগত জীবনের ভুলকে মুহূর্তের মধ্যে শুধরে নেয়। অকস্মাৎ আবির্ভূত সে-মুহূর্তটি সম্পর্কে মানুষ থাকে অজ্ঞাত। যে-কোনো সময়ে সে-মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটতে পারে। 'তিলোত্তমা' গল্পটিতে গোকুলের জীবনে তেমনই একটি মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটেছিল যার ফল হয়েছিল ইতিবাচক। বনফুল জীবনের সেই ইতিবাচক মুহূর্তটিকে তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

নকুল নন্দীর পুত্র গোকুল বিএ পাশ, নাট্যাভিনেতা। তাস খেলে, আড্ডা দিয়ে, শখের থিয়েটারে অভিনয় করে দিন কাটায়। বিয়ের বাজারে সে সুপাত্র, কারণ শহরের উপর পিতার ত্রিতল বাড়ি, তেজারতি ব্যবসা এবং মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি। একদিন নকুল নন্দী স্বয়ং কোষ্ঠী, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সবদিক বিচার করে ছেলে গোকুলের জন্য তিলোত্তমা ওরফে তিলু নামের এক পাত্রী নির্বাচন করেন। শুভদৃষ্টির সময় পিতা-পুত্র দুজনেই ঘাবড়ে যায়। গোকুল ঘাবড়ায়, কারণ তিলোত্তমা মোটা, কুৎসিত হাঁদামুখো, কালো; আর নকুল ঘাবড়ান বেহাইটি নগদ পাঁচশ টাকা পণ কম দিয়েছেন বলে। দানপত্র যা দিয়েছেন তা অত্যন্ত খেলো। তিলুর গুণ হলো সে মহিষের মতো খাটতে পারে। যা হোক তাঁরা আবার ছেলের বিয়ে দিবেন – এ কথাটি তিলুকে গোকুল জানালো। কিন্তু তিলু তাতে আপত্তি করলো না। বছর কেটে গেলো। একবার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অভিনয়ের জন্য গোকুল গ্রিক পোশাক আনতে কলকাতায় গেলো। স্টেশনে এক বিধবা প্রৌঢ়াকে টিকিট কেটে দিয়ে সহায়তা করলো সে। এ সুযোগে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিয়ে তার মেয়ের জন্য গোকুলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল। গোকুল সম্মতি জানাল। প্রৌঢ়ার মেয়ে উষা শর্ত দিলো, বিয়ের পরই তিলোত্তমাকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে। তিলোত্তমা শর্তটি শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না। বিপর্যয় ঘটলো বিয়ের দিন। তিলোত্তমার শাঁখা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই গোকুলের মনে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ হলো। তৎক্ষণাৎ গোকুল ক্ষমা চেয়ে দুই হাতে মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দ্রুতপদে উপরের ঘরে উঠে গেল।

জীবনযাত্রায় নানা অসঙ্গতি বনফুলের অন্তরের শুদ্ধতার বোধটিকে বারবারই নাড়া দিয়েছে (ঊর্মি নন্দী, ১৯৯৭ : ১০৫)। 'অজান্তে' গল্পের নায়ক কথকের চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনযাত্রার বিভ্রান্তির চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। কথক স্ত্রীর অনেক দিনের আবদার পূরণের জন্য বেতন পেয়ে একটি বডিস কিনে বাড়ি ফিরছেন। বৃষ্টিমুখরিত সন্ধ্যায়, ছাতা মাথায় অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছেন – অনেকদিন পর নতুন জামা পেয়ে স্ত্রী কতটা খুশি হবেন। অমনি ঘাড়ের ওপর একটি লোক এসে পড়লেন। দুজনই পড়ে গিয়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেলেন। জামাটিতে কাদা লাগায় কথক ওঠে লোকটিকে ক্রমাগত মারছেন আর গালি দিচ্ছেন। গোলমাল

শুনে পাশের বাড়ির একজন লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এলেন। ঘটনা শুনে বললেন – 'ওঃ- থাক মশাই মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না! ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী – এই গলিতেই থাকে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৬)। কথক লক্ষ করলেন, লোকটি মার খেয়ে কাঁপছেন – কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছেন।

গল্পটিতে আধুনিক মানুষের হৃদয়যন্ত্রণার, আত্মগত ভালোবাসার ও স্বার্থপরতার রূপটি ওঠে এসেছে। পরিস্থিতির বাস্তবতার প্রতি সহনশীলতার অভাবে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়েন। পরে অন্ধলোকটির জন্য তাঁর অনুশোচনা হয়। বনফুল এই নায়ক চরিত্রের মধ্যে দিয়েই সমকালীন সমাজের বৈনাশিক কালের মানুষের ভালোবাসার স্বরূপটিকে গভীর উপলব্ধি ও নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তুলে এনেছেন।

'বেচারামবাবু' গল্পটি নিম্নমধ্যবিত্ত বেচারামবাবুর দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অনটনের চিত্র। তাঁর পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র। হরিশ মুদির মাসিক পাওনা টাকা, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ভালো করে তত্ত্ব করতে খরচ দেয়ার চাপ, ছেলের হোস্টেল চার্জ পরিশোধের টাকা এরূপ নানামুখী চাহিদা মেটানোর দায় তাঁকে বিপর্যস্ত ও ঋণজর্জরিত করে তোলে। সংসারের দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালনে অপারগতা বেচারামবাবুর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। একরাতে শুতে গিয়ে বেচারামবাবু দেখেন ছেলেমেয়েরা সমানে কাঁদছে; গৃহিণী বলছেন– 'হবে না? শীত পড়ে গেছে কারো গায়ে একটি জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করানো হয়েছিল। ছিঁড়বে না আর। তোমাকে ত বলে বলে হার মেনেছি। কি আর করব বল।' –'বেচারাম এবার আর কিছু বললেন না। শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৭)। মোমবাতিটার উপমায় লেখক বেচারামবাবুর জীবনীশক্তিকে তুলে ধরেছেন। কেরানি জীবনে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে বেচারামবাবু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন। সমকালীন সমাজ-পরিবেশের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন বনফুলের এই গল্পটি।

'মানুষের মন' গল্পটিতে মানবমনের বিচিত্র প্রবাহের একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। নরেশ ও পরেশ সহোদর ভাই। দুজনই গোঁড়া; নরেশ গোঁড়া বৈজ্ঞানিক, পরেশ গোঁড়া ধার্মিক। পিতা তাদেরকে সমান ভাগে বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। তাদের ছোট ভাই তপেশের ছেলে পল্টু, বয়স ষোল। তপেশ এবং তার স্ত্রী মনোরমার কলেরায় মৃত্যু হলে পল্টুকে তাঁদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। পল্টু হঠাৎ অসুখে পড়ে। পরেশ ও নরেশ দুজনই তাঁদের বিশ্বাসমতে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার আর কবিরাজের দ্বারস্থ হলেন। পর্যায়ক্রমে দুসপ্তাহ অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার আর কবিরাজের চিকিৎসা চালিয়ে ব্যর্থ হলেন তাঁরা। পরে শরণাপন্ন হলেন

জ্যোতিষীর। তার কথামতো একটা প্রবাল কিনে পল্টুর হাতে বেঁধে দিলেন। এরইমধ্যে তাঁরা দুজনে গোপনে তাদের যুক্তিমতো চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। এ পরিস্থিতিতে পল্টুর হঠাৎ শ্বাস উঠে মৃত্যু হলো। নরেশ ও পরেশ দুজনই পল্টুকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসার কাছে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিশ্বাস ও নীতিকে বিসর্জন দিলেন। ভালোবাসার কাছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার যুক্তিবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাভবের ছবি 'মানুষের মন' গল্পটি।

বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক বনফুল তাঁর গল্পে ক্ষুদ্র পরিসরেই মনের বিচিত্র রহস্যলীলার খণ্ডাংশের প্রতি আলোকপাত করে চরিত্রের পূর্ণতা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রথমে 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পটির আলোচনা করা যাক। গল্পে নিম্নবিত্ত চরিত্র 'অর্জুন মণ্ডল'কে লেখক প্রত্যয়বাদী দৃঢ় ব্যক্তিত্বের বলে জীবনযুদ্ধে উজ্জ্বলতার প্রতীকরূপে রচনা করেছেন। অনেকটা যেন বনফুলের জীবনবাসনার এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। গল্প কথকের আবাল্য পরিচিত এই অর্জুন মণ্ডল অর্থাৎ অর্জুন কাকা এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ। সামান্য একটি ঘটনা তাঁকে বিদ্যার্জনের মহিমা উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। ঘটনাটি হলো– অর্জুন মণ্ডলের কাছ থেকে প্রতিদিনই জমিদারের সেপাইরা বিনা পয়সায় মাছ নিত। একদিন তারা অর্জুন মণ্ডলের বড় একটা রুই মাছ কেড়ে নিচ্ছিল। এ সময় মাছ না দেয়ায় অর্জুনকে তারা চড় মারে। অর্জুনও পাল্টা চড় মারলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। সেপাইদের হাত থেকে রক্ষা পেতে অর্জুন কথকের ডাক্তার বাবার কাছে গিয়ে সাহায্য চায়। ডাক্তারের কথায় সেপাইরা তার কাছ থেকে মাছ নেয়াই বন্ধ করে দেয়। ঘটনাটি অর্জুন মণ্ডলকে বিস্মিত করে। সে বুঝলো বিদ্যার কত প্রতাপ! ঘটনার দিন সাতেক পর সে জ্ঞানার্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং কথকের ডাক্তার বাবার কাছে গিয়ে সাহায্য চায়। জাতিতে কৈবর্ত অর্জুন মণ্ডল তাঁর পেশা ঠিক রেখে কম্পাউন্ডারি পাশ করে স্থানীয় হাসপাতালে চাকরি নেয়। এরই মধ্যে সে চিকিৎসা-সংক্রান্ত সহজবোধ্য বাংলা বই মুখস্থ করে ডাক্তারি বিদ্যাতেও দক্ষতা অর্জন করে। রবিন্সন ক্রুশো, গালিভার্স ট্রাভেল্স জাতীয় বিভিন্ন বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থচর্চার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখে। সে ড্রেসারের পরীক্ষায় অতি উৎসাহের বশে পরীক্ষকের চেয়ে বেশি জ্ঞান প্রদর্শন করার অপরাধে ফেল হয়ে যায় প্রথম বছর। নিজের জামাইদের বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বিরক্ত হয়ে তাদের প্রহার করতেও সে দ্বিধা করেনি। নিজের জামাই বা নাতিরা মানুষ না হওয়ায় আজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে গল্প কথককে ডাক্তারি পড়তে বিলেত পাঠাতেও চায় সে।

শেষে দেখা যায়, স্বনির্ভর ও দ্বিধাহীন চরিত্র অর্জুন মণ্ডল ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে সামঞ্জস্যসাধনে অসমর্থ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে তীর্থযাত্রায় মনস্থির করে। যাওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ পালঙ্কসদৃশ বিরাট এক সিন্দুক তৈরি করে, যেন তার মধ্যে সে তার

জীবনের আবশ্যক জিনিসপত্র ঢুকিয়ে নিতে পারে। দেখা গেল সিন্দুকটি এত বেশি রকমের বড় যে সেটিকে কোনভাবেই ট্রেনে তোলা গেল না। সারা জীবন ধরে যে আদর্শভাবনায় সে নিজেকে নিয়োজিত করলো তার কোনো সফলতাই দেখতে পেলো না তাঁর উৎকেন্দ্রিক মনোভাবের ফলে। তাঁর অস্বাভাবিক আকারের সিন্দুকটি যেন তাঁর-ই ব্যক্তিত্বের প্রতীকরূপে চিত্রিত হয়েছে।

'অণুবীক্ষণ' গল্পে লেখক পাশাপাশি দুটি চরিত্রের অন্তরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। একটি ভদ্রবেশি আকর্ষণীয় চরিত্র, অন্যটি কদর্য চেহারার। আকর্ষণীয় অনিন্দ্যকান্ত ভদ্রলোক সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সব বিষয়ে পণ্ডিত। সক্রেটিস থেকে ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস তাঁর কণ্ঠস্থ; ভারতবর্ষের বৈদিক যুগ থেকে গান্ধীযুগ তাঁর নখদর্পণে। ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতা সম্পর্কে যিনি নিঃশংয় তাঁর রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তার দেখলেন, তিনি সিফিলিস ও গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত। লেখক পাণ্ডিত্য ও মার্জিত জীবনায়নের অন্তরালে তাঁর চরিত্রের নীচতা, ভণ্ডামি, চরিত্রহীনতা এবং সংযমহীনতাকে এ গল্পে তুলে এনেছেন। অপরদিকে শশধর নামের কুৎসিত ও কদর্য চেহারার লোকটির ঠোঁটের ঘা লক্ষ্য করে ডাক্তার ভেবেছিলেন যে, সে সিফিলিস রোগী, কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাঁর রক্তের মধ্যে কোনো দোষ নেই, তাঁর রক্ত বিশুদ্ধ।

'পরিবর্তন' গল্পে উঠে এসেছে ধনী হরিমোহনের চরিত্রের অভ্যাসের বিশেষ দিকটি। হরিমোহনের যক্ষ্মা হয়েছে। তার স্ত্রী সরমা মৃত্যু অবধারিত জেনে স্বেচ্ছায় স্বামীর উচ্ছিষ্ট দুধটুকু পান করে। কারণ সন্তানহীন জীবনে স্বামীর সঙ্গে সহমরণই ছিল তার কাম্য। কিন্তু হরিমোহনকে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা নিতে সুইটজারল্যান্ডে যেতে হয়। দশবছর পর সুস্থ হয়ে সে দেশে ফেরে। এর আগেই স্ত্রী সরমা যক্ষারোগে মারা যায়। অনেক চেষ্টা করে শেষে সরমা নামের এক পাত্রীর সন্ধান পেয়ে তাকে বিয়ে করে সে। গল্পের শেষে হরিমোহনের উক্তির মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রটি স্পষ্ট হয়েছে– 'থাকতে পারলাম না– দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হ'ল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে বার করলাম শেষে। ও নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আর ফিরবে না জানি, তবু নামটার–' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩১৮)। ধনাঢ্য হরিমোহন প্রথমত বিয়ে না করে থাকতে পারেনি, দ্বিতীয়ত সরমা নামের অভ্যাসটুকু যেন বজায় থাকে সে বিষয়টিকেও প্রাধান্য দিয়েছে।

'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে লেখক মুহূর্তের মহিমায় মানবচরিত্রের ঔদার্যকে প্রতিভাত করেছেন। চুরুটসেবী ইংরেজবেশী এক বাঙালি যুবক বিনা টিকিটে ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা দখল করে নিয়েছে। এক প্রৌঢ়া শ্রীপতি সামন্ত সেই কামরার একটি কোণে বসতে চাইলে তাকে সে বসতে দেয়নি। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে একরকম জোর করে প্রৌঢ়া লোকটি উঠে পড়ে এবং বলে সে তার ভাড়া চুকিয়ে দিবে। পাঞ্জাবি টিকিট চেকার এলো। সামন্ত মহাশয় ভাড়া দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার বাঙালি

যুবকটির টিকিট চাইতে গিয়ে দেখা গেলো তার কাছে দেয়াশলাই, পাইপ ও একটি সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাড়া না দেয়ায় বচসা বেধে গেলো। এ সময় চেকার বাঙালি জাতটিকে অপমান করছে বিধায় তাৎক্ষণিক শ্রীপতি সামন্ত সাহেবটির ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। গল্পটিতে উচ্চ শিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ সাহেবের বিপরীতে অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত একজন প্রৌঢ় মানুষের মহানুভবতা ও চারিত্রিক ঔদার্য্য প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তমপুরুষের জবানিতে বিবৃত 'খুড়ো' গল্পটিতে বনফুল এক নিম্নবিত্ত প্রৌঢ়ের উদাসীনতাকেই রূপদান করেছেন। এই প্রৌঢ়ের জীবনের প্রতি কোনো মোহ নেই। পূর্বতন জমিদারদের অন্নে প্রতিপালিত, অধুনা দরিদ্র নিঃসন্তান বৃদ্ধ খুড়ো গ্রামের সকলেরই প্রিয়। সংসারে তাঁর নিত্য অভাব-অনটন কিন্তু মনের প্রফুল্লতার অভাব তাঁর ঘটেনি কখনো। চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেদের সঙ্গে গুলি খেলতেই তার সুখ। একবার শীতের শুরুতে গ্রামের হিতৈষীজনেরা চাঁদা তুলে তাকে লেপ কেনার জন্য দেয়। কিন্তু সে টাকায় লেপ না কিনে খুড়ো একটি সেতার কিনে আনে। খুড়োর এ হেঁয়ালি মনোভাব – অনেকটা যেন বনফুলের শিল্পীমনের বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। লেখক নিজের সঙ্গীতপিপাসু মনের আভাসটুকুর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই খুড়ো চরিত্রের মধ্য দিয়ে (ঊর্মি নন্দী, ১৯৯৭ : ১২১)।

'ক্যানভাসার' গল্পে লেখক এক ক্যানভাসারের জীবনের করুণ ও কঠিন বাস্তবের রূপায়ণ করেছেন। গল্পটির কাহিনী হচ্ছে – ভৈরব তার স্ত্রী কাত্যয়নীর সঙ্গে কলহ করে দ্বিপ্রহরের কড়া রোদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। সামনে একটি নিমগাছ পেয়ে তার ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে শুরু করে সে। এ সময় ক্যানভাসার হীরালালের সঙ্গে তার দেখা হয়। ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়াতে ওভারক্যারেড হয়ে তাকে এ গ্রামেই আসতে হলো। ভৈরবকে প্রথম কাছে পেয়ে সে দাঁতের মাজন বিক্রির চেষ্টা করলে ভৈরব ক্ষেপে যায়। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে ভৈরবের এক চপেটাঘাতে হীরালালের বাঁধানো দাঁতের পাটি পড়ে গিয়ে সে ফোকলা হয়ে যায়। তার কালো কুচকুচে গোঁফজোড়াটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ভৈরব। বৃদ্ধ বয়সে এরূপ জীবন সংগ্রামে শ্রদ্ধায় হীরালালের কাছে তার মাথা নত হয়ে আসে। সে তার ভুল বুঝতে পেরে একটি নিমের মাজন কিনে নেয়। গল্পটি হীরালালের অস্তিত্ব রক্ষার গভীর বেদনার পরিপূর্ণ রূপায়ণ।

'চৌধুরী' গল্পটি জীবনযুদ্ধে অপরাজিত ব্যক্তিত্বের কথারূপ সৃজনের বয়ান। গল্পের নায়ক কংসারি চৌধুরী। তার অভিধানে হার বা পরাজয় বলে কোনো শব্দ নেই। জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ, খোসামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল অর্থাৎ কাজ হাসিলের উদ্দেশে যখন যা প্রয়োজন হয়েছে তাই করেছে নির্দ্বিধায়। সে গ্রামে পিতার নামে স্কুল-স্থাপন, মাতার নামে অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি,

খুন, বড় বড় মামলা, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ – এমন কি শিশু হত্যা পর্যন্ত করেছে। একদিন হঠাৎ সে অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কংসারি চৌধুরী হার মানার পাত্র নয়। অন্যের সাহায্য নিয়ে সে বেঁচে থাকবে না, তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। এ আত্মহত্যা তাঁর পরাজয়ী মনোভাবের পরিচায়ক নয়; বরং মৃত্যুর উপর অপরাজেয় পৌরুষের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা।

'বুধ্‌নী' গল্পে বিল্টু চরিত্রের আদিমতার দিকটি প্রকটিত হয়েছে। হাজারীবাগের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সন্তান বিল্টু। সে একদিন মহুয়া গাছের তলায় বুধনীকে দেখতে পায়। তখন থেকে বিল্টু বুধ্‌নীর পিছু নেয় তাকে নিজের করে পেতে। কঠিন শক্তির পরীক্ষা দিয়ে সে বুধ্‌নীকে জয় করে। দুবৎসর বাদে বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করে, প্রেয়সীমূর্তির পরিবর্তে তার জননীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিল্টু তার সন্তানকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। সে সন্তানকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে শুরু করে এবং একপর্যায়ে তাকে হত্যা করে বসে। বিল্টুর ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বুধ্‌নী নাম জপ করে যায়। গল্পটিতে প্রেমের গভীরতা ও একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

বনফুলের সমসাময়িক যুগটা ছিল মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগ। সে-যুগের আর্থিক দীনতার চেয়ে ব্যক্তিক দীনতাই বনফুলকে বেশি বিচলিত করেছে। এদিকটির প্রতিফলন 'মিস্টার মুখার্জি' গল্পটি। ডবল এম. এ. রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট চেহারা, ক্ষৌরির অভাব মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট, আধময়লা সাহেবি পোশাক পরিহিত মুখার্জি একজন উঁচু দরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু কেউ কোনোদিন তার কথার প্রতিবাদ করেনি। কারণ তাঁর মিথ্যা কথাগুলো শুনতে বেশ লাগত। এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত আর্টিস্ট ছিলেন। বিলাত ফেরত মুখার্জি তিনবার প্রফেসারি পেয়েও ত্যাগ করেছেন। তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হতো দুনিয়াটা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। তিনি ধূমকেতুর মতো মাঝে মাঝে আড্ডায় এসে মহাত্মাজী থেকে শুরু করে বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্নার্ড শ, বলডুইন, শেক্সপীয়ার, গ্যেটে সবাইকে যেন কথায় কথায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন। প্রায়ই জনৈক কোটিপতি অথবা কোটিপতির কন্যাদের সঙ্গে 'লাঞ্চ' করা, জিনিস উপহার দেওয়া প্রভৃতি কর্মব্যস্ততার ফিরিস্তি দিতেন। একবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরার পথে গল্পকথক দেখলেন অন্ধকার এক গলির মোড়ে হাতে প্যাকেট নিয়ে 'মদনানন্দ মোদক' ফিরি করছে মিস্টার মুখার্জী। সহসা লেখককে দেখামাত্র তাঁর হাত ধরে বললেন– 'একটা অনুরোধ–এ কথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়ত জিনিসটা ঠিক বুঝবে না – ভাববে হয়ত অভাবে পড়েই–' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ১৩১)। গল্পের এ ট্রাজিক পরিস্থিতিতেই লেখকের জীবনবোধের প্রকাশ। দারিদ্র্যের যন্ত্রণার চেয়েও করুণ ছিল মুখার্জীর আত্মার যন্ত্রণা। এ কারণে মুখার্জীকে মিথ্যাবাদী হিসেবে না দেখে বনফুল তাকে সমবেদনায় চিত্রিত করেছেন।

'ছোটলোক' গল্পে লেখক এক রিক্সাওয়ালার আত্মসম্মানবোধ কতটা প্রবল তা দেখিয়েছেন। রাঘব সরকার কারো অনুগ্রহের প্রত্যাশী নন, পারতপক্ষে কারো দ্বারা উপকৃত হতে চান না। যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন। লেখকের ভাষায় – 'স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তার জীবনের সাধনা' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ২৭৬)। একদিন দ্বিপ্রহরের কড়া রোদ মাথায় নিয়ে দ্রুতপদে পথ হেঁটে যাচ্ছেন উন্নত মস্তক রাঘব সরকার। গায়ে খদ্দরের জামা, মাথায় ছাতা নেই, তার ওপর পায়ের জুতোর অবস্থাও সুবিধার নয়। এ সময় এক রিকশাওয়ালা তাঁকে রিকশায় চড়তে বলে, কিন্তু তিনি তাকে না বলে দেন। রিকশাওয়ালা তাঁর পিছু নেয়। 'সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বলশেভিজম, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি, অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট! হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ২৭৬)। এবার রাঘব সরকার রিকশাওয়ালার কাছে শিবতলাতে যেতে কয় পয়সা লাগবে জানতে চাইলো। রিকশাওয়ালা বলল ছয় পয়সা লাগবে। রাঘব সরকার তাকে সঙ্গে আসতে বলল এবং হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। আর রিকশাওয়ালা তাঁর পিছু ছুটলো। এভাবে দুজন শিবতলায় পৌঁছল। রাঘব সরকার ছয় পয়সা ভাড়া চুকিয়ে দিতে গেলে রিকশাওয়ালার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগলো। রিকশাওয়ালা বলল, সে কারো কাছ থেকে ভিক্ষে নেয় না।

বনফুলের 'তপন' গল্পে মানবচরিত্র-রহস্যের ভিন্ন এক দিকের উদ্ভাসন লক্ষ করা যায়। চপলার বিবাহপূর্ব প্রণয়ী তপন স্বাধীনতা আন্দোলনে শরিক হয়ে দশ বছর জেল খেটেছে। জেল থেকে পালিয়ে সে চপলার কাছে আসে এবং নতুন করে ঘর বাঁধার প্রস্তাব করে তাকে। চপলার সম্মতি পেয়ে তপন চপলার স্বামীকে (রায়সাহেব) হত্যা করে তার কাছে ফিরে আসবে কথা দিয়ে চলে যায়। কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। চপলা তপনের অপেক্ষায় থাকে কিন্তু অকস্মাৎ তপনের পরিবর্তে তার স্বামীর আগমন ঘটে। গল্পটিতে নারী চরিত্রের রহস্যজনক এক দিকের প্রতিফলনের মাধ্যমে লেখক সুস্থ জীবনপ্রত্যাশী শিল্পিমনের এক স্বতন্ত্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'ভক্তিভাজন' গল্পটিতে লেখক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামধনের বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তাকে রূপদান করেছেন। গল্পটিতে ধনাঢ্য জনার্দন জীবনে বহু ব্যক্তিকে বহু সাহায্য করেছেন। কিন্তু কেউ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকেনি। মৌখিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করে সবাই সরে পড়েছে। দৈবাৎ সে দরিদ্র এক রামধনের সাক্ষাত পেয়ে তাকে প্রাণ খুলে দান করতে চাইলেন। নিরক্ষর রামধন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও সে শূদ্রের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেনি। লেখক এ গল্পে অতি দরিদ্র এক

ব্রাহ্মণ তার বংশমর্যাদা রক্ষায় কতখানি নির্লোভ হতে পারে সেদিকটি তুলে এনেছেন।

'ভোম্বলদা' গল্পে বনফুল ভোম্বলদার চরিত্রের সহজ-সরল এবং অসহায় দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ভোম্বলদা মোটাসোটা গোলগাল চেহারার সদাহাস্য ব্যক্তি। নাকে নস্য লাগিয়ে সে প্রতিদিন সকাল হতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিচিত পথিকমাত্রকেই সহাস্যমুখে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে এবং সবার সঙ্গে সব বিষয়েই একমত পোষণ করে থাকে। ভোম্বলদা অফিসে বড়বাবুর কাছে ছোটবাবুর এবং ছোটবাবুর কাছে বড়বাবুর সম্বন্ধে সবকথা সরলমনে বলে দেয়ার কারণে সে চাকরি হারায়। কেউ তাঁকে আমলে নেয় না এমনকি তার গৃহিণী পর্যন্ত। সবার কথায় সায় দিতে গিয়ে পরস্পরবিরোধী কথা বলে ফেলে গৃহিণীর বকুনি খায়। যেদিন এ অবস্থা চরমরূপ ধারণ করে সেদিন ভোম্বলদা গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। গঙ্গার সঙ্গে সে ভাব বিনিময় করে। ভোম্বলদার সরল চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

'স্ত্রী-চরিত্র' গল্পটিতে সুনন্দা চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্ত্রী চরিত্রের বিশেষ দিকের প্রকাশ ঘটেছে। সুনন্দার স্বামী তমালকান্তি। সে যখন ঘুমাত সুনন্দা তখন শিয়রের কাছে আলো জ্বালিয়ে বাংলা মাসিক পত্রিকা পড়ত। এক রাতে মাসিকপত্রে 'গল্প নহে' শিরোনামে একটি প্রেমের গল্প পড়ে সে অবাক হয়ে যায়। প্রথমত গল্পের নামটি তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়, দ্বিতীয়ত গল্পে গল্প-লেখকের নাম থাকায় অবাক হয় সে। গল্পটির কাহিনী হচ্ছে – নির্মলা ও বিশ্বনাথ পরস্পরকে ভালোবাসে। বিশ্বনাথের মাতুল একদিন তাদের দুজনকে প্রেমরত অবস্থায় দেখে ফেলে – 'মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধকস্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ১৩৯)। মাতুল কাদম্বিনীর সঙ্গে বিশ্বনাথের বিয়ে দিয়ে দেন। বিশ্বনাথ প্রথম দিকে রুখিয়া দাঁড়নোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কারণ সমাজকে ঠেকানো তার সাধ্যাতীত – বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ, নির্মলা কায়স্থ। বিশ্বনাথ ও নির্মলার মিলন না হওয়ায় গল্পের এ পর্যায়ে এসে নির্মলার জন্য সুনন্দার কষ্ট শুরু হয়। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই সেই কষ্ট ঈর্ষায় পর্যবসিত হয়। পরদিন সন্ধ্যাবেলা তমালকান্তি অফিস থেকে বাসায় ফিরলে ক্ষোভে, দুঃখে তার হাতে সুনন্দা 'গল্প প্রভাকর' নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিটা তার হাতে তুলে দেয়। তমালের মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে যায় বছর দুই পূর্বে (তার বিয়ে ও চাকরির আগে) সে *গল্প প্রভাকর* পত্রিকায় 'গল্প নহে' শিরোনামে গল্পটি পাঠিয়েছিল। সে নিতান্তই গল্পের খাতিরে গল্পটি লিখেছে। সুনন্দা তমালের কোনো কথাই বিশ্বাস করে না। নির্মলার প্রতি ঈর্ষায় তার সমস্ত অন্তঃকরণ পুড়তে থাকে। সুনন্দার এখন

একমাত্র কাজ নির্মলা কেমন রূপসী তা দেখা এবং তার ঠিকানা খুঁজে বের করা। গল্পটিতে বনফুল অতীত প্রেমের অবতারণা করে স্ত্রী-চরিত্রের এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

'কশাই' গল্পটিতে মানবমহিমার চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুহূর্তটিকে লেখক তুলে এনেছেন রহিম কশাই চরিত্রটির মাধ্যমে। রহিম কশাই দুলালবাবুর বাবার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল। টাকা শোধ দিতে না পেরে শেষে সুদের সুদ, তার সুদ ও হিসাবের মারপ্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে সবশেষে সে রাজি হয় এই শর্তে – প্রতিদিন আধ-সের পাঠার মাংস সে দুলালবাবুর বাপকে দেবে। দুর্মূল্যের বাজারে রোজ রোজ কচি পাঠার মাংস জোগাড় করতে কশাইকে হিমশিম খেতে হয়। কিছুতেই রহিম কশাই আর পেরে উঠছে না। সারাটা দিন রোদে ঘুরে ঘুরে সে হতাশ হয়ে পড়ে। মাংস জোগাড় করতে না পেরে তার মাথায় খুন চড়ে যায়। সে দুলালবাবুর বাপের চতুর্থ পক্ষের নধরকান্তি শিশুটি যে গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে মাংস কাটা দেখত তাকে জবাই করে পাঠার মাংস বলে তার বাসায় পাঠিয়ে দেয়। পরদিন বাবুর্চি এসে খবর দেয় – 'কাল তুই যে মাংস দিয়েছিলি একেবারে ফাসট্ কেলাস। খেয়ে বাবুর দিল তর হয়ে গেছে। চেটেপুটে খেয়েছে সব–' 'খোকাটাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে তোকে ডেকে বকশিসই দিতো হয়ত। পাশের গলিতে খেলছিল – কোথায় যে গেল ছেলেটা।' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪০৫)। কশাই বাবুর্চির কথাগুলো শুনে পচ করে মাংস কুঁচোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে! গল্পটিতে মানবচরিত্রের ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

ইংরেজি সাহিত্যে ভার্জিনিয়া উলফ্, ডরোথি রিচার্ডসন এবং ফরাসি সাহিত্যে মারসেল প্রুস্ত ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক ধারণাকে অবলম্বন করে গল্প উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের সমকালে যাঁরা এ বিষয়টিকে নিয়ে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনফুলের মনস্তত্ত্ববিষয়ক গল্পগুলো হলো – 'যুগলস্বপ্ন', 'অনির্বচনীয়', 'ভিতর ও বাহির', 'ছেলে-মেয়ে', 'নারীর মন', 'ঐরাবত' ও 'শ্রীধরের উত্তরাধিকার'।

মনস্তত্ত্বমূলক গল্পের আলোচনার শুরুতেই 'ঐরাবত' গল্পটির কথা ধরা যাক। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ত্রিগুণানন্দবাবু, বিএ পাস। তাঁর স্ত্রী অনেক আগেই আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর দুই ছেলে রায় বাহাদুর ও রায় সাহেব। চল্লিশ বছরের এ ধার্মিক ও প্রচণ্ড সংযমী ব্যক্তিটির প্রজাদের উপর রয়েছে অপরিসীম প্রভাব। তিনি তাঁর কয়েক বিঘা জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি করেছেন। চারক্রোশ দূরে কিষণপুর গ্রামে বটবৃক্ষতলে ত্রিগুণাবাবু একটি পাঠশালা খুলেছেন। সেখানে সকাল থেকে ৯টা পর্যন্ত

প্রধানত ব্রহ্মচর্যা বিষয়ে পড়ানো হতো। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এ জ্ঞান লাভ করতে পারলে দুঃখদুর্দশা অচিরেই বিলুপ্ত হবে। এক সকালে তিনি গিয়ে দেখেন ব্রহ্মচর্যশিক্ষার্থী তাঁর ছাত্ররা লোলুপচিত্তে একটি নগ্ন নারীমূর্তি সম্বলিত *মরমী* মাসিক পত্রিকা পড়ছে। এতে রয়েছে একটি অশ্লীল কবিতা, একটু ভিতরে একটি ছবি যাতে দেখানো হয়েছে একটি রোগা ছোকরা কীভাবে চারটি তরুণীর মহড়া নিচ্ছে। এ ঘটনায় ত্রিগুণাবাবু ক্ষেপে, কলকাতায় গিয়ে *মরমী*র সম্পাদক, চিত্রকর, গল্পকার ও কবিকে গুরুতররূপে আঘাত করে। এতে কবি অমিয় পালিত মারা যান। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন ত্রিগুণাবাবু। মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখেন এবং দেশের ছেলেদের চরিত্র গঠন বিষয়ে ভাবেন। একরাত্রে ত্রিগুণাবাবুর ভাবনায় হঠাৎ ফুটে উঠে সিনেমায় দেখা নায়িকাটি তাঁর পানে চেয়ে মৃদু হাসছে। তিনি স্বপ্নটি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে জেগে ওঠে নায়িকার অবর্ণনীয় ছবি। সিনেমার নায়িকা, কখনো রাস্তায় দেখা নায়িকার লাস্যময়ী ক্রিয়াকলাপ তাঁর মনের মধ্যে খেলা করতে থাকে। তিনি অনুধাবন করলেন– 'আমার মনের কামনা মরে নাই। ঘুমাইয়া ছিল। সেই স্বপ্ন কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবী করিতেছে।' শেষে দেখা গেল, ত্রিগুণাবাবু গোঁফদাড়ি কামিয়ে, আধুনিক যুবকদের মত দশ আনা, ছআনা চুল ছেটে; হাল ফ্যাশানের তন্বী সুন্দরীকে বিয়ে করে গ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে এসেন্সের গন্ধ ছড়াচ্ছে। গল্পটির বিষয় মানুষের মনের একান্ত গভীরে যে কামনা-বাসনার বীজ সুপ্ত থাকে তা অনুকূল পরিবেশে মাথা তুলে আত্মপ্রকাশ করে। বাইরের কাঠিন্য এবং কৃচ্ছ্রতার দ্বারা সেই বীজকে ধ্বংস করা যায় না (নিশীথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৮ : ৯৮)।

'যুগল স্বপ্ন' গল্পে স্বামী-স্ত্রী হাসি ও অজয়ের দুটি স্বপ্নের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমে হাসির এবং পরে অজয়ের স্বপ্ন দুটির বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবে তারা সুখী দম্পতি। পাশাপাশি শুয়ে দুজনেই অবচেতন মনে স্বপ্নে দেখছে প্রাক্-বিবাহ পর্বে তাদের পূর্বেকার প্রেমিক-প্রেমিকার সুখময় স্মৃতি। হাসি সুধীরকে নিয়ে বিচরণ করছে স্বপ্নের রাজ্যে, আর অজয় বিচরণ করছে অলকাকে নিয়ে, হাসির মমতামাখা হাতখানি অজয়ের বুকের উপর পড়ে আছে। গল্পটিতে উঠে এসেছে হাসি ও অজয়ের বাস্তব জীবনের অন্তরালে তাদের আরেকটি ক্রিয়াশীল মনোজগৎ।

'অনির্বচনীয়' গল্পে ইংরেজিতে অনার্স মাতৃহীন ক্ষণিকা খাস্তগীর থাকেন বাবার সঙ্গে। মাতৃহীন কন্যাকে পাত্রস্থ করার মানসে বাবা মেয়ের জন্য একটি দোজবরে পাত্রের প্রস্তাব করলেন। ক্ষণিকা এ প্রস্তাবে আত্মহত্যা করবে জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। পরদিন ক্ষণিকা তার বান্ধবী সুজাতাকে বাবার প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলে। সুজাতা শুনে এর ঘোর বিরোধিতা করে। আইন করে এসব বিয়ে বন্ধ করা উচিত বলে সে মত দেয়। কিন্তু মাসখানেক পর দেখা যায় ওই দোজবর পাত্র অজয় বোসের

সঙ্গে সুজাতার বিয়ের নিমন্ত্রণলিপি পরিচিত মহলে বিতরণ হচ্ছে। সুজাতার বিয়ের পর ক্ষণিকা বুঝতে পারলো অজয় বোস একজন রসিক ব্যক্তি, সুজাতা সুখীই হবে! কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টো। সুজাতা আত্মহত্যা করে এবং অজয়বাবু আবার বিয়ে করে। এবার কিন্তু 'লভ্ ম্যারেজ।'এবার পাত্রী ক্ষণিকা খাস্তগীর। কাহিনিটিতে লেখক সূক্ষ্ম নারী-মনস্তত্ত্বের বিশেষ একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

'ছেলে-মেয়ে' গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটিতে পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেলেও শেষে দেখা যায় ছেলে সন্তানের জন্য তীব্র বাসনার কথা। আন্নাকালী ও নমিতা দুজনেই আসন্নপ্রসবা। হাসপাতালের একই রুমে পাশাপাশি খাটে তারা অবস্থান করছে। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান অনেক। আন্নাকালীর অষ্টম সন্তান হবে। তার স্বামী কেরানি। সপ্তম সন্তান প্রসবের সময়ে যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল, তাই এবার ডাক্তারের পরামর্শে হাসপাতালে এসেছে সে। নমিতা সুন্দরী, তার স্বামী ডাক্তার। এবার তার প্রথম সন্তান হবে। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না যে সে গর্ভবতী। দুজনেই পুরুষ মানুষ সম্পর্কে বিশেষ করে স্বামীর নানাবিধ দোষকীর্তনে হাসপাতালে পুরোটা সময় ব্যয় করেছেন। বৃষ্টিমুখর একরাতে আন্নাকালী মেয়ে সন্তান আর নমিতা ছেলে সন্তান প্রসব করে। মেয়েকে দেখামাত্রই আন্নাকালীর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। নমিতার ছেলে হয়েছে জানতে পেরে সহসা সে আর্তনাদ করে ওঠে। কারণ জ্যোতিষীর মতে এবার তার ছেলে হওয়ার কথা ছিল। নমিতার স্বামী ডাক্তার হওয়ায় তার ছেলেকে নমিতার মেয়ের সঙ্গে বদল করে দিয়েছে বলে তার দাবী। তার সাতটা মেয়ে, সে আর মেয়ে চায় না। চিৎকার করে সে হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে। এদিকে নমিতা সভয়ে তার শিশুপুত্রটিকে বুকের কাছে টেনে নেয়। লেখক ঘন্টা খানেকের ব্যবধানে দুই নারী চরিত্রের যে মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তা যথার্থই প্রশংসার দাবিদার।

'ভিতর ও বাহির' গল্পটি রামকিশোরবাবুর দীর্ঘদিন মৃতপ্রায় অবচেতন মনটির হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠার গল্প। বিপত্নীক রামকিশোরবাবু পেশায় উকিল। খুনিকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী সৃষ্টি করার প্রয়াস, গরিব প্রজার সর্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শ – এসব কাজে সে পটু। এবং এক্ষেত্রে তিনি বাইরের মনটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ভিতরের মনটি এইরূপ কাজে প্রতিবাদ করে করে মৃতপ্রায়। একবার এই রামকিশোরবাবুর কাছে প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক বত্রিশ টাকা ফি নিয়ে আসেন সম্পত্তির বাটোয়ারা বিষয়ে পরামর্শের জন্য। প্রৌঢ় লোকটি জানান, দশ বছর পূর্বে তার এক আত্মীয়ের একমাত্র ছেলের বিয়ে হয়। আজ অবধি তারা সন্তানহীন। এ অবস্থায় তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কারা হবে? অনেক আইনি মারপ্যাঁচের পর রামকিশোরবাবু তাঁর স্বকীয় মতটা পুনরায় জানালেন – 'ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার ত

শ্মশান। আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাকে বল্‌লাম – আপনার সেন্টিমেন্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪২)। দিন পাঁচেক পর রামকিশোরবাবুর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে এসেছে – 'রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুটি চাপিয়া ধরিয়াছে! হতবাক রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন। সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি তুমি বলেছ, বাবা' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪২)।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরীর মতো ব্যঙ্গ ও হাস্যরসপ্রধান গল্প লেখকদের মধ্যে বনফুল অন্যতম। বনফুলের ব্যঙ্গ রচনার প্রধান মাধ্যম ছিল *শনিবারের চিঠি*। উক্ত পত্রিকায় বনফুল ব্যঙ্গরচনার পাশাপাশি সমসাময়িক আধুনিক সাহিত্যের ওপরে বেনামিতে 'স্যাটায়ার'ও লিখেছেন। এ জাতীয় রচনায় পরিমল গোস্বামী বনফুলকে উৎসাহ দিয়েছেন। ফলে *কল্লোল-প্রগতি-কালিকলম* ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবৃত্তিমূলক সাহিত্যকর্ম হিসেবে রূপকধর্মী একটি ব্যঙ্গ রচনা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেন পরিমল গোস্বামী। সেই লেখা প্রকাশিত হয় *শনিবারের চিঠি*র আশ্বিন, ১৩৪০ সংখ্যায়। বনফুলের ব্যঙ্গরচনার অপূর্বদক্ষতার কিছু পরিচয় তা থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল–

> ...আমার এক বন্ধুপত্নী তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মাইবার পর বছরখানেক পরে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। – সিম্পটম মিলাইয়া ঔষধ দিলাম। কিছুই হইল না। – আসিলেন কবিরাজ – বলিলেন বায়ু কুপিত হইয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। –
>
> হঠাৎ একদিন রাত্রে ধরিল পেটে ব্যথা। ক্ষীরোদবাবু আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, 'এ লেবার পেন।' – শেষ রাত্রি নাগাদ ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, এ আপনি হবে না, ফরসেপ্ ডেলিভারি করতে হবে – যাই হোক ক্ষীরোদবাবু ফরসেপ লাগাইলেন। প্রসবও করাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! কি সন্তান হইল জানেন? ছেলে নয় মেয়ে নয়, মন্‌স্টার নয় – যাহা ডাক্তারি কেতাবে লেখা তাহার কিছুই নয়। বাহির হইল–
>
> ১. একতাড়া প্রেমপত্র।
>
> ২. কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ।
>
> ৩. কয়েকখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।
>
> স্বচক্ষে দেখিয়াছি মশায়। সবগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িয়াছিও। তাহার পর বন্ধুবর এখান থেকে চলিয়া যান। সহসা দেখিতেছি সমস্ত মাসিকে সেইসব পত্র, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসাদি বাহির হইতেছে। আঁতুড়ে ঘরের গন্ধ এখনও যেন উহাদের গায়ে আছে। এগুলিও ঠিক তদ্রূপ।... (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৬১)।

তাঁর জনপ্রিয় 'জনার্দন' কবিতাটি শুনে নিখিল দাস নামে এক ভদ্রলোক একবার হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। 'শালা' কবিতাটি তীব্র ব্যঙ্গমূলক কবিতা। 'বিবাহের ব্যাকরণ' 'ছারপোকা'–এ সময়কার কবিতা। 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে বনফুলের কৌতুকের নিদর্শন 'ফরমায়েসি প্রিয়' গল্পটি। তাঁর এ জাতীয় আরও গল্প–'অদ্বিতীয়া', 'পূজার গল্প', 'অলকানন্দা', 'যুগান্তর', 'দত্ত মহাশয়' প্রভৃতি।

'পূজার গল্প' নামক গল্পটিতে লঘু হাস্যরস প্রকাশিত হয়েছে। কথক বিষ্ণুচরণ বর্মা ইনশিওরেন্সের দালাল। পূজার দুই-একদিন আগে সিমলা থেকে বঙ্গদেশে ফিরছিলেন। তিনি যে কামরাটিতে উঠলেন তাতে অপরূপ সুন্দরী তিন মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাদের সঙ্গে এক সুদর্শন যুবক ছিল। যুবকটি এক অভিনেত্রীর অর্ধনগ্ন চিত্র-সংবলিত একটি সিনেমা সাপ্তাহিক মনোযোগ দিয়ে দেখছে। এ সময় কথক তাকে সম্বোধন করে প্রথম কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলার এক পর্যায়ে তিনি বুঝতে পারলেন তাদের জীবন বীমার প্রয়োজন নেই। কারণ দেবী দুর্গা বঙ্গদেশে চলেছেন, সঙ্গে রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাঁর ভুলের জন্য। কিন্তু দুর্গা তাকে নিরাশ করলেন না, বললেন 'ফর্ম বাহির কর – বঙ্গদেশে পূজাটা ইনশিওর করিয়া রাখি। তোমার বক্তৃতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ২৮)। গভীর ও শ্রদ্ধেয় চরিত্রে বিসদৃশ ভাবের সমাবেশে গল্পটিতে হাস্যরস জমে ওঠেছে। এ গল্পে বিষ্ণুচরণ বর্মা স্বয়ং তাঁর বক্তৃতার দ্বারা জগজ্জননীকে পর্যন্ত মুগ্ধ করে দিয়েছেন।

'অদ্বিতীয়া' গল্পে ছয় সন্তানের জনক দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে গিয়ে চূড়ান্তভাবে নাজেহাল হওয়ার ঘটনাটি হাস্য ও ব্যঙ্গ কৌতুকে উপস্থাপন করেছেন লেখক। প্রভাবতী সপ্তম সন্তান প্রসব করবে বলে তার স্বামী নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে প্রভাবতীর বোন সেজদি তার সঙ্গে একশ টাকা বাজি ধরে এই বলে যে, প্রভাবতী মারা গেলে তার স্বামী তিন মাসের মাথায় আবার বিয়ে করবে। ফলে বোনরা মিলে এক ফন্দি আঁটে এবং প্রভাবতীর স্বামীকে জানায় সন্তান প্রসবের সময় প্রভাবতীর মৃত্যু হয়েছে, এবং সন্তানদের দেখভালের জন্য তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে অনুরোধ করে। স্বামী সহজেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। বাজিতে সেজদিরই জয় হয়। গল্পটি হাস্যরসের হলেও প্রকৃতপক্ষে হতভাগিনী নারীর মূক যন্ত্রণা পাঠকের মনকে বিষণ্নতায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। গল্পটিতে আপাত হাস্যরসের মধ্য দিয়ে করুণ রসের সুর বেজে উঠেছে। প্রকৃত হাস্যরসিক লেখকমাত্রই বাহ্য হাসির প্রসন্ন দীপ্তির আড়ালে বেদনার গাঢ় মেঘকে দেখিয়ে দেন। প্রভাবতীর জীবনের দীর্ঘদিনের সযত্নলালিত স্বামী-প্রেম অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আঘাতের

সম্মুখীন হয়। তাছাড়া প্রভাবতীর সেজদির এই উক্তিটির মধ্যে লেখক পুরুষ–স্বভাবের একটি দিকের প্রতিও ঈঙ্গিত দিয়েছেন।

'অলকানন্দা' গল্পটির কাহিনি অলকানন্দা নামে একটি পত্রিকাকে অবলম্বন করে। পত্রিকাটির প্রকাশক ধনেশ। বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যঙ্গকার দিগিন্দ্র সোম, সুকবি পঞ্চুমিত্র, জীববিদ্যা-বিশারদ প্রখরেশ পাল, পণ্ডিত প্রভাকর শর্মা, ব্যায়ামবীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠক এবং ঐতিহাসিক বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় পত্রিকার প্রকাশনা নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় হঠাৎ হেবো এসে সবাইকে আশাহত করে। সে জানায় প্রকাশক ধনেশ পত্রিকার জন্য এবার এক পয়সাও দেবে না। একমাত্র দিগিন্দ্র সোম সহজে হাল ছাড়লেন না। তিনি একটি দল পাকালেন এবং সব লেখককে তাঁর দলে ভিড়িয়ে একটি সভা আহ্বান করলেন। উদ্দেশ্য প্রকাশককে শায়েস্তা করা। কিন্তু কাজ হলো না। আবারও মুরারিমোহনের পরামর্শে দ্বিতীয়বার সভা বসল। এবং সবাই মিলে ধনেশের গুরু কঙ্করানন্দের কাছে গেলেন। কিন্তু এবারও ধনেশকে রাজি করানো গেলো না। রাজনীতিক, কবি, গুরু, পণ্ডিত, বাবা সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে চিৎপুর অঞ্চলের মদিরাক্ষী এক যুবতীর কথাতে ধনেশ শেষে কাবু হলেন। 'বলা-বাহুল্য, ধনেশ পুরুষ মানুষ। সুতরাং সে কাবু হইল। শুধু কাবু নয় – ঢালা হুকুম দিল – যত টাকা লাগে – কুছ পরোয়া নেই' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ১০৭)। তবে শর্ত অলকানন্দার প্রতি সংখ্যায় ওই যুবতীর একটি ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে। গল্পটিতে নির্মল কৌতুক করা হয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন দুর্বলতা গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করছে।

'দত্ত মহাশয়' গল্পটিতে ধনী কুসিদজীবী দত্ত মহাশয় তৃতীয় পক্ষের বিয়ের জন্য যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সে দিকটির প্রতিই বনফুল ব্যঙ্গ করেছেন। দত্ত মহাশয় তাঁর মাতৃহীন একমাত্র অনূঢ়া কন্যার বিয়ের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেয়ে বিয়ের কথা পাকা করেন। পরে ওই পাত্রটির সম্পর্কে মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারির কথা শুনতে পান তিনি। এ অবস্থায় টাকা ধার নিতে আসা দ্বিতীয় ব্যক্তি উকিল বাঁড়ুয্যের কাছে পাত্রটি সম্পর্কে জানতে চান – 'আচ্ছা স্টেশনের নতুন ছোটবাবুটির (পাত্র) নামে কি মোকদ্দমা হয়েছে নাকি একটা মেয়েকে নিয়ে। জানো তুমি?–' 'হ্যাঁ জানি বই কি– আমিই তো উকিল ছিলাম রেলের পক্ষের। কিছুই নয় – একটা বাইজি আর তার সঙ্গে এক সারেঙ্গিওলা বিনা টিকেটে যাচ্ছিল – ছোটবাবুটি তাঁদের ধরে চালান দিয়েছিল। ছোকরা ভারি অনেস্ট। অপর কেউ হলে দুচার পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিত–' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ১২৭)। এবার দত্ত মশায় নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়ের বাবার কাছে বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করতে চিঠি দিলেন, সঙ্গে আরো একটি চিঠি ছেড়ে দিলেন এক শিশি কলপের জন্য। চিঠি শেষ করে অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে বলে উঠলেন – 'পয়সার মায়া করলে চলবে না – ভেস্তে যাবে সব–। দ্বিতীয় পত্রখানি

লিখিলেন কলপের জন্য' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ১২৮)। তাকেও তো তৃতীয় পক্ষের বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। গল্পটিতে বৃদ্ধ দত্ত মহাশয়ের একমাত্র মাতৃহীন অনূঢ়া কন্যার বিয়ের সঙ্গে নিজের তৃতীয় পক্ষের বিয়ের প্রস্তুতি নেয়াকে ব্যঙ্গ করেছেন বনফুল।

'দোলের দিনে' গল্পে মেকি আভিজাত্যের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন লেখক। অখিলবাবুর স্ত্রী সুজাতা বিলেত-ফেরত। ফিরপো, লেডল, হ্যামিল্টন, আর্মি-নেভির আবহাওয়ায় মানুষ। তাদের দুই মেয়ে অনিমা, তনিমা এবং ছোট ছেলে ওস্তাদ। অখিলবাবু কোর্ট থেকে ফেরেন পাঁচটায়, জলখাবার খেয়েই আবার ক্লাবে যান। ফেরেন রাত দশটায়। তাদের বাড়ির আশেপাশে যত কুলিমজুর মুটেমিস্ত্রি মারোয়াড়িদের বাস। অখিলবাবুর কর্মচারী জিতেনবাবু অনেক চেষ্টায় শেষে ছোটলোকদের পাড়ায় এ বাড়িটি খুঁজে বের করেছে। কিন্তু দোলের দিন আসায় বাড়িতে থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় বাড়ির চারপাশে পাড়ার ছেলেদের ঢোল-বাজনা, গায়ে ধুলো-কাদা মেখে চিৎকার এবং অনিমাকে দেখতে পেয়ে হৈ-হৈ করে ওঠা, ঢোল আর খঞ্জনি বাজিয়ে মহানন্দে নৃত্য– যেন দমবন্ধ পরিবেশ। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে সুজাতা গলির দিকের খোলা জানলাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখনও উন্মত্ত জনতা উল্লাস করছে রাস্তায় রাস্তায়। এদিকে আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠছে, অশোক, পলাশ অগ্নিশিখার মতো মূর্ত হয়ে উঠছে, স্বর্ণকান্তি কণিকার পুষ্পভারে শাখা-প্রশাখা অবনত, কোকিল ডাকছে, ভ্রমর গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠছে কানন কান্তার। প্রকৃতির এ আহ্বানকে উপেক্ষা করে ছ্যাকড়া-গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে সুজাতা দেবী পাড়ি জমাচ্ছেন সভ্য পাড়ায়। আভিজাত্য কখনো সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। সুজাতা দেবী মুহূর্তের জন্য হলেও দোলের আনন্দে শরিক হতে পরেননি। লেখক এ গল্পে মেকি আভিজাত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

'যুগান্তর' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র পাঁচকড়ি পোদ্দার। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি রচিত। তিনি হরিণহাটি গ্রামের ধনসম্পদশালী মহাজন। এই গ্রামের সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতই চূড়ান্ত; শুধু তাই নয়, তাঁর মতকে মেনে নিতে পারলে গ্রামবাসীরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করত। লেখকের ভাষায় – 'জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমন অচল।' এই পাঁচকড়ি পোদ্দার সকল প্রকার আধুনিকতার বিরোধী। বোতামের বদলে ফিতা, জুতার বদলে খড়ম ব্যবহার করেন তিনি। স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়ের সঙ্গে তিনি তাঁর একমাত্র ছেলের বিয়ের কথা পাকা করে রাখেন। এই বিয়ে নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে দীর্ঘ চার বছর পত্রবিনিময় চলে। একদিন বিয়ের তারিখ স্থির করে পাঁচকড়ি ছেলেকে বাড়ি আসতে চিঠি লেখেন। কিন্তু ছেলে চিঠির

জবাবে জানায় – 'বাবা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পূর্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ কথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিয়া আসিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ১১০)। পরের দিন হঠাৎ বিশ্বনাথের তার বাড়িতে আসার কথা জানতে পেরে সম্মান বাঁচাতে পোদ্দার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। ছয় মাস পর তীর্থ থেকে ফেরার পথে কাশীতে পোদ্দার বিশ্বনাথের আরো একটি পত্র পান। পত্রটিতে বিশ্বনাথ লিখেছে – পোদ্দারের ছেলের সঙ্গেই প্রতিশ্রুতিমতো তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় থাকতে পোদ্দারের ছেলে ছকড়ি প্রায় তাঁর বাসায় যাতায়াত করাতে কুসুমের সঙ্গে তার বেশ ভাব জমেছিলো। মেলামেশাটা বেশিরকমের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ায় এবং তাদের বিয়ের কথা পাকা থাকাতে বিশ্বনাথ আর কালবিলম্ব না করে তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেন। পোদ্দারকে না জানিয়ে তাঁর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। পত্র পাবার পর পোদ্দার হরিণহাটিতে ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরেই দেখেন ছকড়ির খোকা হয়েছে। খোকার অমলকুমার নাম তার পছন্দ হয়নি। তিনি পুনরায় নাম রাখলেন নকড়ি।

গল্পটিতে দুটি যুগের পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এক যুগ থেকে আরেক যুগে রূপান্তর ঘটিয়েছেন পোদ্দার আর ছকড়ির মাধ্যমে। আর এ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন – মূঢ় সংস্কার মানুষের মর্মমূলে কেমন করে বাসা বেঁধে থাকে এবং জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। লেখক হাস্যরসের মাধ্যমে এবং একটি নাটকীয় আমেজ সৃষ্টি করে গল্পের আবেদনকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে আশ্রয় করে লেখা বনফুলের ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক গল্প বাংলা সাহিত্যে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। বনফুলের প্রেমের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় *উত্তরা* পত্রিকায়, পরে সেগুলো *সুরসপ্তক* (১৯৭১) গ্রন্থে সংকলিত হয়। বনফুল এম বি বি এস পরীক্ষা শেষে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন তিনি নববধূ লীলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য প্রেমের কবিতা লেখেন। বনফুল তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে লিখেছেন :

> এবার মা-বাবা ছাড়া আরও একটি আকর্ষণ ছিল – নববিবাহিত বধূ – লীলা। সে আমার জন্য কলেজ কামাই করিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনে নতুন রং লাগিল। আমার সাহিত্যেও একটা নতুন মোড় ঘুরিল। লীলা হোস্টেলে চলিয়া গেলো। প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখিতে শুরু করিলাম। পরিমল তাহার স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে যে এই সময়টা আমি সাহিত্যচর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না। কিন্তু যে সাহিত্য আমি তখন রচনা করিয়াছিলাম তাহা

> মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত এবং সে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। এই চিঠিগুলির কয়েকটি পরে আমি পরিবর্তন করিয়া আমার *কষ্টিপাথর* (১৯৫১) উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রেমের কবিতাগুলো অনেকদিন পর সুরেশ তাহার উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং আমি সেগুলো সুরসপ্তক পুস্তকে সংকলন করিয়াছি। *চতুর্দশী* (১৯৪০) নামক সনেটগুলোও লীলাকে কেন্দ্র করিয়াই লেখা।... সজনীকান্ত এগুলি শনিবারের চিঠিতে দুই সংখ্যায় প্রকাশ করে। এ কবিতাগুলি কবি মোহিতলালের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল (বনফুল, পশ্চাৎপট, ১৯৯৯ : ১৫২)।

বনফুলের উল্লেখযোগ্য প্রেমের গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে 'চান্দ্রায়ণ', 'ট্রেনে', 'চোখ গেল', 'সামান্য ঘটনা', 'ঝুলন পূর্ণিমা', 'যুথিকা', 'চিঠি পাওয়ার পর', 'স্কুলের স্মৃতি', 'ক খ গ', 'বুধনী', 'চলচ্ছবি', 'সংক্ষেপে উপন্যাস', 'শাজাহান' প্রভৃতি।

উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা 'চিঠি পাওয়ার পর' গল্পটি একটি অপূর্ব প্রেমের গল্প। কথকের অমিতা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিল। তাদের প্রেম স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। সে প্রেমে কোনো ব্যক্তি বা সামাজিক বিধিনিষেধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। প্রেমের গভীরতায় স্বয়ং বিধাতাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ একদিন কাশতে কাশতে কথকের মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এলো। তাঁর যক্ষ্মা সত্ত্বেও অমিতা তাঁকে চেয়েছিল। কিন্তু কথকের বিবেক বাধলো, তাই তিনি অমিতাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেলেন। অমিতার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলো। অনেক দিন পর কথক অমিতার চিঠি পেলেন। 'উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ি পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌঁছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থাকবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেক দিন আপনাকে দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে। আসবেন ত? আশা করি একবারে ভুলে যাননি' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩১০)।

কিন্তু কথক মুহূর্তের জন্য অমিতাকে ভুলেননি। তার জীবনের বিগত স্বপ্ন পুনরায় জেগে উঠে। বার বার তিনি অমিতার চিঠিটা খুলে খুলে পড়ছেন। ভাবছেন পাঁচ মিনিট সময়ের দেখায় তাকে কী বলবেন। অমিতার পছন্দের ডালমুট ভাজা আর সাদা গোলাপ নিয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করেন। অপেক্ষার যেন শেষ নেই। অপেক্ষার সমাপ্তি টানতে এক সময় রেলওয়ের এক কর্মচারীর কাছ থেকে জানতে চাইলেন লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসতে আর কত দেরী। কিন্তু বিধি বাম, লোকটি জানালেন, এখন সাড়ে নটা বাজে, লক্ষ্ণৌগামী ট্রেন আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখেন সাড়ে সাতটা বেজে আছে। অমিতার চিঠি পেয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার দরুন ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছেন তিনি।

'চান্দ্রায়ণ' গল্পটি বিবাহিত নারীর পূর্ব প্রেমিকের প্রতি হৃদয়ের আকুলতার প্রকাশ। চন্দ্রবাবু আর এম এস এর সর্টার, প্রৌঢ় ব্যক্তি। লেখকের ভাষায় তাকে ঝুনা

নারিকেল বলে মনে হয়। তিনি রসিক ব্যক্তি। ঝুনা নারিকেলের অন্তরে যেমন শাসজল থাকে তেমনি তার চিত্তে ছিল তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা মাধুরী। চন্দ্রবাবুর স্বভাবের একটি নেতিবাচক দিক হলো অন্যের চিঠি খুলে পড়া, টাকা থাকলে আত্মসাৎ করা সেই সঙ্গে কারো ভালো ছবি নিয়ে নেয়া। তবে চিঠিগুলো তিনি মাধুরীকে পড়ে শোনাতেন তার মন জয় করার জন্যে। তিন দিনের ডিউটিতে বেরিয়েছেন তিনি। একবার ট্রেনের কামরায় তিনি একা বসে আছেন। এ সময় বাছাইকৃত পাঁচটি চিঠি একটি একটি করে খুলে পড়া শুরু করেন। প্রথম চিঠিটি নমিতা নামের এক মেয়ে তার দিদিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে। চিঠিটি পড়ে তিনি নিরাশ হলেন। দ্বিতীয় চিঠিটিতে রয়েছে পারিবারিক আর্থিক টানাপোড়েনের কথা। তৃতীয়টিতে পুরুষের হস্তাক্ষর দেখে হতাশ হয়ে চতুর্থ পত্রটি খুললেন। এ পত্রটি তাকে নেশা ধরিয়ে দেয়। বাড়ি ফিরে পত্রটি তিনি মাধুরীকে পড়ে শোনাবেন। পঞ্চম চিঠিটি পড়তে শুরু করেন–

> 'অনঙ্গ, তুমি আসবে শুনে সুখী হলাম। তোমারই আশায় পথ চেয়ে আছি। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যেখানে হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেভাবে রাখবে সেখানেই তেমনিভাবে থাকব আমি। কেবল এ নরক থেকে উদ্ধার কর আমাকে। তুমি দেরী করো না। বুড়োটা কাল সকালে ডিউটিতে বেরুবে– তিনদিন পরেই ফিরবে আবার। আশা করি কাল বিকেলে কিংবা সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরী থাকবো। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও।
>
> ইতি
>
> তোমারই মাধুরী
>
> (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ২৯৬-৯৭)।

চন্দ্রবাবুকে শেষ পর্যন্ত অন্যর প্রেমপত্র পড়ার খেসারত দিতে হলো। প্রেমিকের উদ্দেশ্যে লেখা তার স্ত্রীর প্রেমপত্র পড়তে হলো যেখানে তাকে বুড়ো এবং তার সঙ্গকে নরক যন্ত্রণা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে প্রেমিকের কাছে মিনতি করা হয়েছে।

বনফুলের সমাজচেতনার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসে। 'ভাষণ'–এর একটি রচনায় তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট – 'মুল্যবৃদ্ধি রোধ করা তখনই সম্ভবপর হবে যখন আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার বদলে আসবে একতাবোধ ও দৃঢ় চরিত্রবল। একতাবোধ থাকলে আমরা সকলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে জিনিস কিনবো না মূল্য ন্যায্য না হওয়া পর্যন্ত এবং কালোবাজারীর প্রশ্রয় দেবো না। তখনই মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য প্রতিবাদ সফল হবে (পবিত্র সরকার, ১৯৯৯ : ২১৮)। বনফুলের গল্প উপন্যাসে তাঁর এই সমাজ ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। চিকিৎসাসূত্রে বনফুল উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে শুরু করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ

সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। সে সুবাদে সমাজের নানা কুসংস্কার, ধনী-দরিদ্রের ব্যাপক ব্যবধান, মানুষের নীচ প্রবৃত্তি, অর্থলোলুপতা, ধনী কর্তৃক দরিদ্রের শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ব্যাপক।

'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ' গল্পে লেখক পল্লিসমাজের সংকীর্ণ জীবনাচরণের একটি খণ্ড চিত্রকে তুলে ধরেছেন। একদিন একই সময়ে প্রবীণ শৈলেশ্বর এবং শ্যামা ধোপানিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। শৈলেশ্বরের হিতৈষী হালদার মহাশয় সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন একটা মোকদ্দমার তদ্বির করতে শৈলেশ্বর খুলনা গিয়েছে। আবার এই হালদার মহাশয়ের সঙ্গে প্রবীণ ভাদুড়ী মহাশয়ের দেখা হলে হালদার মহাশয় তাকে নিম্নস্বরে বলেন 'ছি-ছি, শৈলেশ কি কেলেংকারিটাই না করলে। রাম রাম!' আর খোঁড়া মল্লিক মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করলেন যে, শ্যামা ধোপানি পালাবার আগের দিন তার স্বামী পিরু-ধোপার কাছে মার খেয়েছিল। নিষ্কর্মা পুরুষের দল শৈলেশ্বর ও শ্যামা ধোপানিকে নিয়ে একটি গুজব রটিয়েছিলো – শৈলেশ্বর শ্যামা ধোপানিকে নিয়ে পালিয়েছে। শৈলেশ্বর-পত্নী পুত্রকন্যাসহ বাবার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। প্রতিবেশীদের মুখে তার স্বামী ও শ্যামা ধোপানিকে ঘিরে সব কুৎসার কথা তিনি শুনলেন। এ পরিস্থিতিতে সনাতনপুরের নারীরা একমত হলো এখন থেকে নিজেদের স্বামীদের প্রতি কঠিন নজর রাখবে তারা। দিন কয়েক পর শ্যামা ধোপানি ফিরে এলো। কিন্তু গুজবের নিষ্পত্তি হলো না। গ্রামবাসীরা এবার গুজব ছড়ালো, শ্যামা ধোপানি শৈলেশ্বরের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে। এর কয়েক দিন পর মল্লিক মহাশয় গ্রাম প্রান্তরের পুরানো কুয়া থেকে শৈলেশ্বরের মৃতদেহ আবিষ্কার করলো। ধারণা করা হচ্ছে, অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে গিয়ে কুয়ায় পড়ে শৈলেশ্বরের মৃত্যু হয়েছে।

পণপ্রথা বাঙালি সমাজে এখনো বহালতবিয়তে বিরাজমান; শুধু এর ধরনটা পাল্টেছে। ধরনে এসেছে ভদ্রতার লেবাস। এ পণপ্রথার কারণে মধ্যবিত্ত পরিবারে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং ভাঙন দেখা দেয়। বৃন্দাবনবাবু তাঁর ট্যারা পুত্র নিকুঞ্জবিহারীর বিয়েতে পণ গ্রহণ করার ফলে যে লজ্জাকর পরিস্থিতির শিকার হলেন তারই সংক্ষিপ্তসার 'মকরধ্বজ মহিমা' গল্পটি। একই ব্যাংকে কর্মরত বৃন্দাবনবাবু ক্যাশিয়ার এবং ত্রিলোচন দাঁ কেরানি। বৃন্দাবনবাবুর ছেলে নিকুঞ্জের সঙ্গে ত্রিলোচনের মেয়ে কাদম্বিনীর প্রেম! নিকুঞ্জ ট্যারা আর কাদম্বিনীর খাঁদা নাক ও কালো রং। ত্রিলোচন বৃন্দাবনের কাছে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। সুযোগ লুফে নিতে বৃন্দাবন নগদ তিন হাজার টাকা পণে রাজি হন। ত্রিলোচন পণের টাকা জোগাড় করতে ব্যাংকের ম্যানেজার মকরধ্বজ ভার্গবের সাহায্য চাইলেন। ভার্গব এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন যে দুই কুলই রক্ষা পেলো এবং বৃন্দাবনের পণ নেয়ার শিক্ষা হলো। তার পরামর্শে বিয়ের দিন স্থির হয়। বর-কনে বাসরঘরে অপেক্ষা করছে আর বৃন্দাবন অপেক্ষা করছেন পণের টাকার জন্য। যথাসময়ে পণের টাকা আসে। কিন্তু

সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে। ভার্গব এসে বৃন্দাবনকে বলেন – 'আমি এইমাত্র খবর পাইলাম যে ব্যাংক হইতে তিন হাজার টাকা চুরি গিয়াছে এবং তাহা নাকি আপনার বাড়িতেই আছে। আপনি পণস্বরূপ যে টাকাগুলো পাইয়াছেন সেগুলি কোথায়?"...

ভার্গব আগাইয়া গিয়া নোটের গোছা তুলিয়া লইলেন। "এই তো আমাদের ব্যাংকেরই ছাপমারা নোট!"

... টাকাগুলি যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর পুলিশে খবর দিব না, দিলে অনর্থক একটা হাঙ্গামা হইবে।

বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন– "আপনাকে হয়তো অ্যারেস্ট করবে।"

"আমাকে ! কেন?

"কারণ আপনি ক্যাশিয়ার।'

মিস্টার মকরধবজ ভার্গব যে-পন্থা অবলম্বন করে ত্রিলোচনকে তিন হাজার টাকা পণের হাত থেকে বাঁচালেন তা বৃন্দাবনবাবুর জন্য যেমন শিক্ষা হয়ে রইল, তেমনি ত্রিলোচনের মেয়ের বিয়েটাও হয়ে গেল পণবিহীনভাবে। নিকুঞ্জবিহারী যেমন ট্যারা তেমনি কাদম্বিনীও কুরূপা, দুজনেরই শারীরিক ত্রুটি রয়েছে – এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাদের বিয়ে পণবিহীনভাবে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ পরিস্থিতিতেও ছেলের বাবা পণ দাবি করে বসে। কারণ ছেলের বাপ বলে কথা।

'অমলা' গল্পটিতে পাত্রী-নির্বাচনে ও পণের চাহিদা নিয়ে দরকষাকষির ফলে পাত্রীর নিজস্ব পছন্দ ও ভাবনার ব্যাপারটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে – সেই দিকটিই বনফুল তুলে ধরেছেন। বিবাহযোগ্য মেয়ে অমলা; সে তিন বার 'পাত্রী নির্বাচন' পরীক্ষা দেয়। প্রথমবার অমলাকে দেখতে এসেছে পাত্র অরুণের ভাই বরুণ। মেয়ে পছন্দ হয়েছে শুনে অমলার মনে আনন্দের সীমা নেই। সে রাতে অমলা স্বপ্নই দেখে ফেলল! কিন্তু বিয়ে হল না কারণ দরে মিলল না।' দ্বিতীয়বার দেখতে এসেছে পাত্র স্বয়ং, নাম হেমচন্দ্র। এবারও অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলো। আবার অমলার মন ধীরে ধীরে নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল। এবার দরে বন্‌ল কিন্তু মেয়ে পছন্দ হলো না, তৃতীয়বার মেয়ে পছন্দ হল, দরে বন্‌ল এবং বিয়ে হলো। পাত্র বিশ্বেশ্বরবাবু, মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক। বি এ পাশ – সদাগরি আপিসে চাকরি করেন। অমলার সঙ্গে যখন বিশ্বেশ্বরবাবুর শুভদৃষ্টি বিনিময় হলো তখন কি জানি একটা মায়ায় অমলার বুক ভরে গেল। অমলা শান্তশিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে সুখেই আছে। লেখক আবেগহীন, নির্মেদ ভাষায় বর্ণনা করেছেন – অমলা সুখেই আছে।

'পাশাপাশি' গল্পটিতে বিবাহিত ও অবিবাহিত দুই যুবকের বেকার সমস্যা প্রকটরূপ ধারণ করেছে। গল্পকথক কিছুকাল ইনশিওরেন্সের দালালি করেন। কিন্তু সুবিধা করে

উঠতে না পারায় চাকরির সন্ধানে কলকাতা আসেন। রূপার একটি গড়গড়া বাঁধা দিয়ে, জমানো দশ টাকা নিয়ে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় বিকাশবাবুর বাসায় গিয়ে উঠেন। একপাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেকার বিকাশবাবুর অভাব অনটনের সংসার। প্রতিদিন সকালে তিনি অফিসের সময়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে ইডেন গার্ডেনে একটি বেঞ্চিতে শুয়ে বসে থেকে সারাটা দিন কাটিয়ে দেন। কারণ দেরী হয়ে গেলে বেঞ্চটি দখল হয়ে যাবে। বাসায় ফেরেন রাত্রি দশটা, এগারটায়। বিকাশবাবুর শরণাপন্ন হলে একটা চাকরি জুটতে পারে এই ভেবে কথক দিন তিনেক পর তার সঙ্গে আলাপ করেন। জানতে পারেন বিকাশবাবুর বাবার রাখা fixed deposit-এর সুদ থেকে তাঁর সংসার চলে। এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাস, তিন বছর চেষ্টা করেও চাকরি জোটাতে পারেননি। অথচ বউ জানে কোনো বড় আপিসে বিনে মাইনেতে তিনি অ্যাপ্রেন্টিসি করছেন। কিছুদিন পর মাইনে হবে।

'উৎসবের ইতিহাস' গল্পটিতেও ভয়াবহ বেকার-সমস্যার কথা রয়েছে। গল্পটি পাঁচটি পর্ব বা অধ্যায়ে রচিত। ১ম পর্বে উৎসবের বর্ণনা; ২য় পর্বে উৎসবের জন্য প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের কাছে সিক্স পারসেন্ট সুদে টাকা ধার; তৃতীয় পর্বটি নরেন মল্লিকের চাকরি পাওয়ার কৌশলের বর্ণনা; চতুর্থ পর্বে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্কা কুৎসিত কন্যাটিকে বিয়ে করার শর্তে তিরিশ টাকা বেতনের চাকরি (কেরাণিগিরি) লাভ এবং পঞ্চমপর্বে জানা যায়, নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম এ। গল্পের কাহিনীটি অবরোহী পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন প্রথম শ্রেণীর এম এ ডিগ্রিধারী নরেন মল্লিককে অনেক কসরত করে এবং শর্তসাপেক্ষে একটি চাকরি পেতে হয়েছে।

'ঝুলন পূর্ণিমা' গল্পে রক্ষণশীলতা ও বর্ণসচেতনতার যূপকাষ্ঠে প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মবলিদানের নিষ্ঠুর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকুমারের দুই মেয়ে, বড় মেয়ে কথা ও ছোট মেয়ে লতা। মেয়েদের লেখাপড়া, গান-বাজনা ও বিলাতি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিলাতি কায়দায় চলতে গেলে তাতে বাধা দেন তিনি। নফরগঞ্জের একপাল ছেলেমেয়ের বাপ, কুষ্ঠ রোগী প্রৌঢ় মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে এক হাজার টাকা পণে কথার বিয়ের কথা পাকা করে এসেছেন শ্রীকুমার। শ্রীকুমারের বন্ধু এবং প্রতিবেশী নন্দলাল এ প্রস্তাবটিতে সায় না দিয়ে কথার প্রেমিকা নিখিলের (এম এ ক্লাসের ছাত্র) সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শ্রীকুমার তাতে আপত্তি করেন। কারণ নিখিল কায়স্থ। একজন অসবর্ণ পাত্রের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিবেন না। তার কাছে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীই বেশী উপযুক্ত। একপর্যায়ে মহেন্দ্র গাঙ্গুলী পণের আরও পাঁচশত টাকা বাড়িয়ে একটি পত্র পাঠান। এতে উত্তেজিত হয়ে শ্রীকুমার গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা ভাবেন। দুঃখ প্রকাশ করে বলেন– 'ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলাম চাকরি পাবে বলে। মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছিলাম কতকটা হুজুগে পড়ে,

কতকটা ভালো পাত্রের আশায়। এখন দেখছি দুটো আশাই মরীচিকাবৎ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাও বিশেষ কিছু হয়নি। সুতরাং পথ ও মত বদলাবার সময় এসেছে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩৮২)। গল্পের শেষে কদম গাছের সঙ্গে কথা ও নিখিল ঝুলে আত্মহত্যা করে।

গল্পটিতে লেখক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দারিদ্রজর্জরিত পিতার হৃদয়ের অসহায় করুণ বেদনাকে এবং পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দুটি ভিন্ন বর্ণের প্রেমিক-প্রেমিকার করুণ মৃত্যুকে রূপদান করেছেন। শ্রীকুমার ছেলেদের ভালো চাকরির সন্ধানে এবং মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কতকটা হুজুগে পড়ে, কতকটা ভালো পাত্রের সন্ধানে। কিন্তু যখন দেখলেন দুটো আশাই মরীচিকাবৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে, তখন তিনি পথ ও মত বদলাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আর তাঁর সে পথ প্রাচীন গেঁয়ো পথ।

শিশু বনফুলকে খোলা মাঠে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে শিখিয়েছিলেন বনফুলের দুধমাতা। বনফুলের যতদূর মনে পড়ে তিনি একটি ছোট লাঠি হাতে বনে জঙ্গলে শস্যক্ষেত্রে যদৃচ্ছা বিচরণ করে বেড়াতেন। একারণে বাড়ির কাজের লোকেরা তাঁকে জংলিবাবু বলে ডাকত। সেখান থেকেই বনফুলের প্রকৃতি-পাঠের দীক্ষা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর বার্ড-ওয়াচিং এবং তখন থেকেই বনফুলের সব পাখি চেনা হয়েছে। বনফুলদের বাড়িতে অনেক পশু-পাখি পোষা হতো, শুধু তাই নয় বাল্যকালে অনেক কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতির পেছনেও তিনি ঘুরেছেন। বনফুল বলেছেন–'কয়েকটি কুকুরছানা, কয়েকটি খরগোস (দেশি এবং বিলাতি), একঝাঁক পায়রা, শালিক পাখি, টিয়া পাখি আর এক খাঁচা শাদা বিলাতি ইদুঁর। জীবজন্তু পোষার খুব ঝোঁক ছিল ছেলেবেলায়। ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই ছেলেবেলায় অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক হর্ষ বিষাদ আমার চিত্তকে আবর্তিত করিয়াছে' (বনফুল, ১৯৯৯ : ১২)। পশুপাখি ও ইতর প্রাণীদের প্রতি বাল্যকালে তাঁর আকর্ষণ ও কৌতূহল পরিণত বয়সেও দেখা যায়। বনফুলের পশুপ্রীতিমূলক উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো – 'এক ফোঁটা জল', 'পারুল প্রসঙ্গ', 'গণেশ জননী', 'খেঁকি', 'কাকের কাণ্ড', 'করুণাভাজন', 'বাঘা'।

'পারুল প্রসঙ্গ' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে একটি বিড়াল। বিনোদের স্ত্রী পারুলবালার পোষা বেড়াল মেনি মার্জারি। মেনি তার কাছে সন্তানতুল্য। দামি খাবার, দুধ, মাছ খাইয়ে পারুল তার মেনিকে পোষে। একদিন বিড়ালটিকে নিয়ে বিনোদ ও পারুলের মধ্যে তর্ক বাধে। এ সময় বিনোদ মেনিকে লক্ষ করে চটি জুতা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু মারটি বিড়ালের গায়ে লাগেনি। এ ঘটনায় পারুল অভিমান করে বারান্দায় মাদুর পেতে ভূমি-শয্যা নেয়। কোনো উপায় না দেখে বিনোদ লণ্ঠন হাতে রাস্তাঘাট, আমতলা, জামতলা চারদিক খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। পারুলবালা বিনোদকে ভাত খেতে দিতে রান্নাঘরে এসে দেখে কড়াইয়ে দুধ নেই,

ভাজা মাছগুলি অন্তর্হিত এবং ডালের বাটিটা উল্টান। শুতে গিয়ে দুজনে লক্ষ করে তাদের বিছানায় মেনি কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। 'তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৩-৪) – পারুলের এই উক্তিটির মাধ্যমে মেনির প্রতি তার ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ পায়।

'একফোঁটা জল' গল্পটি একটি মঙ্গলা গাইকে ঘিরে রচিত। গল্পের কথক-ডাক্তারকে রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধব নিমন্ত্রণ করেছেন। এতে লেখকের মনে একটু খটকা লাগে। কারণ এদিককার ডাক্তার হিসেবে শ্যামবাবুর মায়ের অসুখের খবরটি তিনি পাবেন বলে আশা করেছিলেন। যা হোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেয়ে শ্যামবাবুর কাণ্ড দেখে ডাক্তারের বিস্ময়ের সীমা নেই। লেখক শ্যামবাবুর কাছে তার মায়ের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন – ও আপনি শোনেননি বুঝি। আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন – তাঁকে আমার মনেও নেই –। ইনি আমার আরেক মা – সত্যিকারের মা ছিলেন। ...আমার মঙ্গলা গাই। ...ওরই দুধে আমার দেহমন পুষ্ট – এই বলেই তিনি হুহু করে কেঁদে ফেল্লেন' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৫)। লেখক এখানে একজন ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা আত্মিক হতে পারে শ্যামবাবুর চরিত্রের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পটির সঙ্গে তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পটির মিল রয়েছে। এই গল্পের কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ নামে মহিষ দুটি রঙ্গলালের একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছিল। তাদের মৃত্যুতে প্রভু রঙ্গলাল অবোধ বালকের মতো কেঁদেছে।

'খেঁকি' গল্পটি একটি কুকুরের আত্মজীবনীমূলক গল্প। গল্পটিতে লেখক মানুষের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। বুলডগ বংশোদ্ভূত একটি কুকুর, যার সর্বাঙ্গে ঘা, চোখে ভালো দেখতে পায় না। স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙ্গা নিয়ে অন্যান্য কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে দিনপাত করত। কিন্তু কুকুরটি সবসময়ে অহংকার নিয়ে থাকত, কারণ তার পূর্বপুরুষ বুলডগ ছিলো। উচ্চ বংশীয় মর্যাদা সে জীবনে একবার হলেও পাবে। একদিন এক সাহেব মহাপ্রভুর গাড়ির A dog box এ কুকুর না থাকায় স্টেশন মাস্টারের চাকরি যায় যায় অবস্থা। তখন সে কুলি মিঠ্‌ঠুকে একটি কুকুর এনে দিতে বললে কুলি তার পরিচিত কুকুর বুলডগকে তার কাছে নিয়ে আসে। কুকুরটি ভাবে তাকে বোধহয় অভিজাত বংশীয় কুকুরদের মতো বেঁধে খাওয়াবে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয় – এটা বুঝতে পেরে কুকুরটি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে এক ভদ্রলোকের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ওই বাসার লোকজন কুকুরটিকে পাগলা কুকুর মনে করে তাড়া করলে কুকুরটি খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়।

'করুণা-ভাজন', 'কাক চরিত্র', 'বাঘা', 'কাকের কাণ্ড' গল্পেও পশু বিরাজমান। শুধু গল্প নয়, বনফুলের উপন্যাসেও পশুপ্রীতির লক্ষণ দৃষ্টিগ্রাহ্য। *মহারানী* উপন্যাসে সিংহ বা ময়ূর ইত্যাদি বন্য পশুর সঙ্গে নায়িকা মহারানীর যোগ কতখানি সে দিকটি

উপস্থাপিত হয়েছে। *ডানা* উপন্যাসে হলুদ রঙের পাখিটির জন্য যোগমায়া দেবীর আকর্ষণ চিত্রিত হয়েছে। *ত্রিবর্ণ* উপন্যাসে সুঠাম ডাক্তার নিজে মুরগি, কুকুর ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে তাঁর অবসর কাটান। মানবেতর প্রাণীদের প্রতি বনফুলের তীব্র আকর্ষণের কারণে তাঁর গল্প-উপন্যাসে এদের স্থান অনিবার্য হয়েছে (নিশীথ, ১৯৯৮ : ১০৫, ১০৬)।

কবি সাহিত্যিকগণ অভ্যন্তরীণ সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ের গল্প' 'তোতাকাহিনী', 'মোপাসাঁর coco (একটি ঘোড়ার কাহিনী) অস্কার ওয়াইল্ডের Selfish Giant (স্বার্থপর দৈত্য), টলস্টয়ের 'How much land does a man requaire' (মাটির নেশা) রূপক গল্পের উদাহরণ। রূপক গল্পগুলি সাধারণত চিরন্তন মহৎ সত্যের মাধ্যমরূপে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রতীকধর্মী কবিরা সাধারণত জ্ঞান আর বুদ্ধির ওপর বেশি জোর দেন না। অন্তরের গভীর বিশ্বাসের প্রতি, উপলব্ধির প্রতি তাঁরা বেশি মনোনিবেশ করে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ বিষয়কে ঘিরে প্রতীকধর্মী গল্পের উদ্ভব ঘটে। সাধারণত ভাবধর্মী লেখকরা তাঁদের ভাব প্রকাশ করার জন্যই বিভিন্ন প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন (নিশীথ, ১৯৯৮ : ১০৬)।

বনফুলের 'ভৈরবী ও পূরবী' একটি রূপকধর্মী গল্প। গল্পটির কাহিনি – এক সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটি ফুল ফোটা ও ঝরে যাওয়া এবং বিশেষ মুহূর্তকে হারানোর ফলে ফুলটির আফসোস করা। বাগানে একটি ফুল ফুটল; ফুলটি যেন বন-লক্ষ্মীর একটি কবিতা, বর্ণে ছন্দে গন্ধে অপরূপ। তার চারদিকে আনন্দের উৎসব; আকাশে বাতাসে যেন কিসের আকুলতা – এসব কিছুই ফুলটি পর্যবেক্ষণ করছে, তার চোখের পলক পড়ছে না। এরূপ আবেগীয় পরিস্থিতিতে ফুলটির কানে কানে গুঞ্জন তুলে একটি ভ্রমর এলো। সে ফুলটির কানে কানে বার বার গুণ্ঠন খোলার আহ্বান করলো। কিন্তু ফুলটি কিছুতেই গুণ্ঠনমুক্ত হতে পারল না। অপরিসীম লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে যায়। শেষে ব্যর্থ হয়ে বিষণ্ন মনে ভ্রমর ফিরে যায়। ভ্রমরটি চলে যাবার পর ফুলটির চৈতন্য হয়। তার মর্মে বারবার গুঞ্জনগানে ভ্রমরের কথাগুলো বাজতে থাকে। সে অধীর আগ্রহে ভ্রমরের জন্য অপেক্ষা করে। প্রভাত ও দ্বিপ্রহর বয়ে যায়, সন্ধ্যা হয় হয়, কিন্তু ভ্রমর আর আসে না। অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে আসে জোনাকি। ফুলটি তখন জোনাকিকে অনুরোধ করে – জোনাকি যেন ভ্রমরটিকে আরেকবার আসতে বলে। পরদিন ওই জোনাকি এসে ফুলটিকে জানায় সে ভ্রমরটিকে খুঁজে পায়নি। জোনাকির কথা শুনে ফুলটি অবাক হয়ে বলে, আমি আজ ফুটেছি, গতকালের ফুলটির পাশের বোঁটায়। এই নতুন ফুলটিও আগের ফুলটির মতো একই অনুরোধ জানায় এবং জোনাকিও পূর্বরূপ জবাব দিয়ে উড়ে যায়। গল্পটিতে জীবনের বিশেষ মুহূর্তের গুরুত্বের কথা রূপকের আশ্রয়ে বলা হয়েছে। কারণ জীবনের মোক্ষম মুহূর্তের সদ্ব্যবহারে মানবজীবন সার্থক হয়।

'অধরা' গল্পটি উত্তমপুরুষের জবানিতে একটি প্রতীকধর্মী গল্প। অন্ধকার মাঠে নায়ক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে সে-ও আছে। তার অঙ্গ-সৌরভ, বলয়-নিক্কন, নিশ্বাসের মৃদু শব্দ সবই নায়ক অনুভব করছে। তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে লেখকের কল্পনায়। তাদের মধ্যে কথোপকথন চলছে নিঃশব্দে – 'আমাকে তুমি ত কখনও দেখনি, তবু চাইছ কেন এত করে?' নায়কের উত্তর – 'তোমাকে আমি জানি।' এভাবে কিছু সময় দুজন পাশাপাশি হাঁটার পর তাদের মনে হচ্ছিল যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে। নায়কের মনে হচ্ছে তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো অন্ধকারকে চিরে গেল। 'সর্বদা ধরে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিইনি।' 'আমি যেখানে চাই সেখানে দাওনি।' 'কোথায় চাও?' 'ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৪১) কথোপকথন চলাকালে নায়কের নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠে, স্পন্দিত হয়ে উঠে অন্ধকার। মনে হলো, সে তার খুব কাছাকাছি সরে এসেছে – তার চোখের জল নায়কের গালে গড়িয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা এক ফোঁটা জল। সহসা খেয়াল হলো বৃষ্টি পড়ছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে নায়ক, সঙ্গে সে-ও রয়েছে। তার ভিজে শাড়ির স্পর্শ অনুভূত হয়। উর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে পৌঁছে সুইচ টিপে আলোতে দেখতে পায়, সে একা, পাশে কেউ নেই। মনের গভীরে অন্তরের ধ্যানলোকে যার অবস্থান, অন্ধকার নীরব পরিবেশের চারদিকে নায়ক তার অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে যাকে ধরা যায় না, সুস্পষ্ট তীব্র আলোতে তার সাকার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, এই উপলব্ধিটিই লেখক রূপদান করেছেন। সাংকেতিক গল্প বাস্তবজীবন ও ঘটনাকে প্রতিবিম্বিত করে না। গল্পটিতে লেখক বাস্তব জীবনকে অতিক্রম করে বিচরণ করেছেন অতীন্দ্রিয়ের রহস্যময় জগতে। 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে ভূদেব চৌধুরী এই গল্পটি সম্পর্কে বলেছেন – 'জীবনের অতীন্দ্রিয় মুহূর্তকে নিয়েও যথেষ্টসংখ্যক গল্প লিখেছেন বনফুল, রোমান্টিক যদি নাও বলি কোন কোন ক্ষেত্রে তা রহস্যচমকিত, কোথাও বা এমনকি সিমবোলিকও।'

'রূপকথা' গল্পটিও এ শ্রেণির গল্প। গভীর রাত্রি, চারদিক জ্যোৎস্নালোকিত, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। দূর হতে নদীর কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে। পচা ডোবাটাকে মনে হচ্ছে যেন জরিদার কাপড় পরে আছে। আকাশের কালো মেঘটাতেও যেন রূপালি আবেশ লেগে আছে। এরূপ পরিবেশে নায়ক অপেক্ষা করছে নায়িকার জন্য। মৃদু হাসি নিয়ে নায়িকা আসে, তার নূপুরশিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিউরে উঠে। আচমকা এক দস্যু এসে কিশোরী নায়িকার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। নায়ক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে আততায়ীকে ধরে। সে বুঝতে পারে আততায়ীটি অন্য কেউ নয়, তারই বিবেক। প্রকৃতির মনোহর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের সত্তা যেন তাকেই প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলছে ছুরি মেরে। চিরন্তন এই সত্যটিই গল্পটির উপজীব্য।

'রাত দুপুরে' গল্পটি প্রতীকধর্মী গল্প। গল্পের নায়কের রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সে খোলা জানালা দিয়ে জোৎস্নালোকিত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, শুভ্র একখণ্ড লঘু মেঘ ছায়াপথের পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সহসা তার মনে হয়- 'সে আসতে পারত কিন্তু আসেনি।' নায়ক বিছানায় উঠে বসে – 'দূর চক্রবালরেখালগ্ন পর্বতশ্রেণি রহস্যময় হয়ে উঠেছে স্বপ্নপুরীর মোহ-মহিমায়-অব্যক্তের ইঙ্গিত যেন উঁকি দিচ্ছে দৃষ্টি সীমানার ওপার থেকে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪২৯-৪৩০)। ধীর গতিতে নায়ক জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে দেখে, দুই প্রান্তের তালগাছদুটো কাছাকাছি এসে যেন কানে কানে কথা বলছে। নায়কের উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্রই তারা দুই প্রান্তে সরে যায়। এ সময় অজানা এক পাখি ডেকে ওঠে। নায়ক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাতদুপুরে প্রকৃতির স্বপ্নময় মায়াপুরীর জগতে বাস্তবের স্পর্শ যেন সবকিছু ভেঙে চৌচির করে দেয়।

বিজ্ঞানের যুগেও অলৌকিক রহস্যময় জগৎ মানুষকে পূর্বের চেয়ে অধিক রহস্যময় করে তুলছে এবং এর আকর্ষণও চিরন্তন। ফলে সাহিত্যে রহস্যময় গল্পের আবেদন অক্ষুণ্ন রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকার – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'মাস্টারমশায়', 'জীবিত ও মৃত', 'নিশীথে', প্রভৃতি গল্পে অলৌকিক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

সাহিত্যিক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন শুধু ভৌতিক আবহে রোমাঞ্চিত হবার মানসে বা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে নয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনই তাঁর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে শাশ্বত সত্যের দিকটিও উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস, মানুষ আত্মহত্যা করলে বা অপঘাতে মৃত্যু হলে তার অতৃপ্ত আত্মার অশরীরী আবির্ভাব ঘটে তার স্বজনদের মাঝে। আবার অনেক সময়ে মানুষের একাগ্রচিত্ত ধ্যানও অলৌকিক পরিবেশে বিচরণে সহায়তা করে, স্বপ্নমাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূর্ত হয়ে উঠে। গল্প-উপন্যাসে বনফুলকে বিশেষভাবে আধুনিক যুগোচিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী লেখক হিসেবেই দেখতে পাওয়া যায়। এহেন ব্যক্তির পক্ষে ভূতের গল্প রচনা পাঠকমনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পৃথিবী যেমন রহস্যময়, জীবন ততোধিক রহস্যময়। এই দুর্বোধ্য রহস্যময় জগতের সবকিছু বিজ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা বিচার করা সম্ভব নয় – এ সম্বন্ধে বনফুল অবগত ছিলেন। বনফুলের ভূতের গল্প পাঠকালে পাঠকের পক্ষে এই মর্ম সত্যই অনুভূত হয়। বনফুলের শিল্পী-আত্মা সম্ভব-অসম্ভবের সীমা-রেখাকে ছাড়িয়ে রহস্যময় জগতে ঘুরে বেড়িয়েছে। দৃশ্য জগতের অন্তরালে আরেকটি জগতের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল এমন বিশ্বাস থেকেই বনফুলের অতিপ্রাকৃত গল্পের সৃষ্টি।

বনফুলের *অদৃশ্যলোকে* গ্রন্থে (১৯৪৬) গল্পসংখ্যা উনিশ। এ গ্রন্থের প্রায় সব গল্পই রহস্যময় ভৌতিক ঘটনা নিয়ে রচিত। বনফুলের মতে, স্পিরিট ওয়ার্লড বা ভৌতিক জগৎ বলে একটি রহস্যময় জগৎ আছে। এই বিষয়ে তিনি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকা থেকে রহস্যময় ঘটনাবলি উদ্ধৃত করেছেন। অদৃশ্যলোকে বিশ্বাস স্থাপনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে বনফুল তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। ১৯২৩ সালের ঘটনা, বনফুল মেডিকেল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসের দোতলার একটি ঘরে বাস করতেন তিনি। এ সময় মস্তক ও গ্রীবার হাড় নিয়ে তখন সূক্ষ্ম অ্যানাটমিতত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তিনি। কলেজের মুন্না ডোম গোপনে বনফুলকে করোটি-হাড় ইত্যাদি সরবরাহ করত। আর বনফুল রাত জেগে সেগুলো অধ্যয়ন করতেন। একদিন মেসের ঠাকুর না থাকায় সেদিন সবাইকে বাইরের খাবার খেতে হয়েছে। শীতের রাত্রি, তাই বনফুল তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম আসছে না বলে এক পর্যায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। যথারীতি বনফুল মোমবাতি জ্বালাতে যাবেন এমন সময় রাস্তার ধারের বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। দরজা খোলা রেখেই মেসবাসীদের শয়ন করার রীতি ছিল। বনফুল হঠাৎ বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন, ভাবলেন, হয়ত আজ তাড়িয়ে দেওয়া ঠাকুরটি চুপিচুপি এসে বারান্দায় পায়চারি করছে। তিনি প্রশ্ন করলেন ‘কে’? কোনো জবাব এলো না। উঠে গিয়ে তিনি দেখলেন ওড়না মাথায় ছিপছিপে অল্পবয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, মুসলমান ঘরের মেয়ে। মেয়েটি তাৎক্ষণিক বনফুলের কক্ষসংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে পড়ল। তিনি ভাবলেন মেয়েটি হয়ত মেসের ঠাকুরের রক্ষিতা তার খোঁজেই এসেছে। তিনি মোমবাতি জ্বেলে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বাথরুমে নেই। সামনের ও পিছনের বারান্দাসহ বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেও তাকে পাওয়া গেলো না। ঘরে প্রবেশ করে বনফুল দেখলেন, পড়ার টেবিলের উপরে রক্ষিত করোটি থেকে কেমন যেন এক অস্পষ্ট আলো বেরুচ্ছে। তাঁর ভয় হতে লাগল। তিনি করোটি ও হাড়গুলো খাটের নীচে ট্রাঙ্কের ভিতর রেখে পাশের ঘরে পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ব্যোমকেশদার কাছে গেলেন এবং সেখানেই রাত কাটালেন।

পরের দিন সকালে তিনি মুন্না ডোমের কাছে গিয়ে করোটি ও হাড়গুলো ফেরত দিলেন। এবং নতুন এক সেট চাইলেন। মুন্না বনফুলকে বলল, পড়াশুনার জন্য এ সেটটা খুবই ভাল। সে নিজে একটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ থেকে ওগুলো সংগ্রহ করে রেখেছে। তার কথা শুনে বনফুল অবাক হলেন এবং সম্পূর্ণ কাহিনিটি জানতে চাইলেন। মুন্না তখন বলল, বেওয়ারিশ লাশগুলো সৎকার করার জন্য ডোমদের দেওয়া হয়। তেমনিভাবে তাকে সৎকার করার জন্য অ্যাকসিডেন্টে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাওয়া একটি মুসলমান মেয়ের বেওয়ারিশ লাশ দেওয়া হয়। সে ওই মৃতদেহটি থেকে সযত্নে করোটি ও হাড়গুলো সংগ্রহ করে রেখেছে। অ্যাকসিডেন্টের সময়ে

মেয়েটির পরনে ছিল সালোয়ার কামিজ ও ওড়না। বনফুল ঝুঝলেন, তিনি ওইরাতে সেই মেয়েটির অশরীরী মূর্তিই প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যুর সঙ্গেই সব কিছু শেষ হয় না। সৎকারহীন অতৃপ্ত আত্মা চারদিকে ঘুরে বেড়ায় – ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক বনফুলের এরূপ বিশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর 'ঘটনা' নামক গল্পে। (বনফুল : ১৯৯৭)।

স্বপ্নতত্ত্ব ও টেলিপ্যাথিতেও বনফুলের বিশ্বাস ছিল। ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বাড়ি কিনেছেন। বাড়িটিতে বেড়ানোর জন্য তিনি বনফুলকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বনফুলের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাড়িটিতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। একরাতে স্বপ্নে বিভূতিভূষণ তাঁকে বলেছেন– 'বলাই, তুমি ত আর ঘাটশিলায় এলে না আমি চললাম।' পরদিন সকালে (১ নভেম্বর, ১৯৫০) পত্রিকা পড়ে বনফুল জানতে পারলেন যে, আগের দিন রাতে বিভূতিভূষণের মৃত্যু হয়েছে (নিশীথ মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৮ : ১০৮)। অন্যের কাছ থেকে শুনে, পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং বনফুলের জীবনের অনেক ছোটখাটো অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর অদৃশ্যলোকের ধারণা জন্মে। তবে তাঁর অদৃশ্যলোকের ভৌতিক গল্পগুলো অবশ্যই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল। স্বপ্নতত্ত্বে বিশ্বাসী বনফুল তাঁর 'স্বপ্ন' নামক গল্পে এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। পুঁটি-বিপিন স্বামী-স্ত্রী। পল্লিতে খোলার ঘরে তাদের কোনো রকমে দিন কাটে। দুইবেলা অন্ন জোটে না, এর মধ্যে পৃথিবীতে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটছে। যেদিন পুঁটির প্রসব-ব্যথা শুরু হলো, সেদিন তাদের বাড়িতে মোটরে করে মধ্যবয়সী এক ধনী ব্যক্তি এলেন। তিনি মহা আয়োজনে পুঁটির প্রসবের ব্যবস্থা করলেন। পরে ধনী লোকটি পল্লিবাসীকে উদ্দেশ্য করে তার আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন – রাজা নেহাল সিং তাঁর মনিব ছিলেন। তাঁকে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে অপুত্রক অবস্থায় তিনি মারা যান। কাল রাতে স্বপ্নে নেহাল সিং তাকে জানালেন পুঁটি-বিপিনের ঘরে তার পুনর্জন্ম হবে। কারণ দারিদ্রের সুখভোগ করবার ইচ্ছা ছিল তার মনিবের। তাই এতসব আয়োজন। গল্পটিতে পুনর্জন্মের কথা আছে; গল্পকার প্রাকৃতের সীমাকে অতিক্রম করে অতিপ্রাকৃতের আমেজ সৃষ্টি করেছেন। বনফুলের রহস্যময় আরো গল্পগুলো হলো – 'অবর্তমান', 'শেষ কিস্তি', 'কেন', 'ছাত্র', 'নন্দী ক্ষ্যাপা', 'প্রমাণ' ইত্যাদি।

'ছাত্র' গল্পটিতে অশরীরী প্রভাব লক্ষ করা যায়। গল্প-কথক একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ছাত্র; স্বপ্নে দেখেন তাঁর বাল্যকালের গুরুকে, যিনি বিশ বছর পূর্বে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেছেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে কথক হোম-টাস্কের নিমিত্তে গৌরীশঙ্কর খুলে বসেন, কারণ থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাববার সময় নেই তাঁর। তাছাড়া তিনি তাঁর প্রিয়তম ছাত্র। হঠাৎ দ্বার ঠেলে থার্ড মাস্টারই এলেন, শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলো

খাড়া হয়ে আছে, কোটরগত চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। তিনি অনুনয়কণ্ঠে এক গ্লাস ঠাণ্ডা খাবার জল চাইলেন, এভাবে তিন গ্লাস জল খাওয়ার পর বলে উঠলেন – 'আঃ বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও–' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৫৫)। এরপরেই কথকের ঘুম ভেঙে যায়। পরদিন তিনি প্রখর রৌদ্রে নিজের গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করে উত্তপ্ত বালির চড়া ভেঙে তিনক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গা অভিমুখে গেলেন তর্পণ করতে। মৃত শিক্ষকের অতৃপ্ত আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করার উদ্দেশ্যে। কথকের মতে – 'আপনারা যাহা বলিবেন, তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্বাক আমিও পড়িয়াছি – নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই – ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৫৫)। থার্ড মাস্টারের অমোঘ আত্মা বিশ বছর পরে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে কথককে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রয়েড, চার্বাকের যুক্তি তাকে ঠেকাতে পারেনি, তাই অশরীরী আত্মার অমোঘ প্রভাবের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে দারুণ দ্বি-প্রহরে গেঁটে বাতের অসহনীয় যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে গঙ্গাভিমুখে চলছেন তর্পণের উদ্দেশ্যে। যে কোনো মূল্যে তর্পণ তাকে করতেই হবে।

'কেন' গল্পটি ভয়ঙ্কর রহস্যময়তাকে জাগিয়ে তোলে। ছেলে হয় আর মরে। ডাক্তার, কবিরাজ কেউ এর গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে পায় না। চতুর্থ শিশুর মৃত্যুর পর মা-বাবা লক্ষ্য করলেন প্রতিটি শিশুর চেহারাই একরকম, যেন একটা শিশুই বারবার জন্মাচ্ছে আর মরছে, তাঁদের প্রশ্ন, কেন? কেন একই ঘটনা পুনরাবৃত্ত হচ্ছে? তাদের কি ঠিকমত যত্ন হচ্ছে না? এই ভেবে পঞ্চম শিশু জন্মাবার সময় সৌখিন নতুন জামা কাপড় দিয়ে আঁতুড়ঘরেই তাকে অভ্যর্থনা করা হলো, কিন্তু সেও বাঁচল না। ষষ্ঠ শিশু জন্মাবার সময়ে ধুমধাম করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হলো; এমনকি রোশনচৌকি পর্যন্ত আনা হলো, সেও বাঁচল না। সপ্তম শিশু জন্মাবার সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো হল, তবু মরে গেলো। পাগলপ্রায় মা-বাবা এবার সিদ্ধান্ত নিলেন অষ্টম সন্তানকে তাঁরা শাস্তি দেবেন, আর যেন না আসে। অষ্টম সন্তানও বাঁচল না, তখন মরা শিশুর হাত পায়ের সবগুলো আঙুল কেটে দিলেন। নবম শিশু ভূমিষ্ঠ হল এক কন্যাসন্তান। মুখ অবয়ব একইরকম কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, হাতে পায়ে একটি আঙুলও নেই। এই শিশুটি মরল না, এখনও বেঁচে আছে! মা-বাবার প্রশ্ন, কেন? লেখক এই গল্পে এক গভীর অতলাশ্রয়ী, অবোধগম্য-রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

'নন্দীক্ষ্যাপা' গল্পটিতে লেখক শ্মশানবাসী এক ক্ষ্যাপা সাধকের অলৌকিক মহিমার কথা ব্যক্ত করেছেন। গল্পকথক ট্রেন থেকে নেমে জানতে পারেন পরের ট্রেন আসতে আরও সাত ঘন্টা বাকি। সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে স্টেশন থেকে একটু দূরে খাবার দোকানে ঢুকলেন। এক দোকানির কাছ থেকে জানতে পারলেন এখানকার শ্মশানের

এক সাধক নন্দীক্ষ্যাপার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। লেখক শ্মশানের দিকে রওনা হলেন। জায়গাটি তাঁর বেশ ভালো লাগল – চমৎকার নির্জন জায়গা। নদীর ধারেই কালীমন্দির। মন্দিরের চারদিকে পাকা প্রশস্ত বারান্দা, এর ভেতরে-বাইরে, কোথাও কেউ নেই। সামনে দাঁড়াতেই কালী প্রতিমা চোখে পড়ায় প্রণাম সেরে নিলেন এবং বারান্দায় গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। চতুর্দিক কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে, একটি পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে। অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি তাঁকে টেনে বসিয়ে রাখল। মনটা উদাস হয়ে গেল। হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি; গিয়ে দেখেন দুজন মহিলা ও ডোমসহ জনছয়েক লোক একটি মড়া এনেছেন নন্দীক্ষ্যাপার উদ্দেশে। কিছুক্ষণ পর নন্দীক্ষ্যাপা এলেন – সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, জবাফুলের মতো লাল চোখ। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। সবার সঙ্গে কথকও যেয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। নন্দীক্ষ্যাপা ব্যাপারটি শোনামাত্রই গালাগাল দিয়ে এবং ইট ছুঁড়ে মেরে সবাইকে তাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের ভিতর থেকে তিনি নন্দীক্ষ্যাপার প্রার্থনার কথা শুনতে পেলেন! 'মা সত্যিই বড় দুঃখী ওরা – যদি পারিস বাঁচিয়ে দে; বাঁচিয়ে দে মা – তুই দয়াময়ী, ইচ্ছে করলে সব পারিস–' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৫৮)। স্টেশনের বাহিরে হঠাৎ একটা শোরগোল শুনতে পেয়ে গিয়ে দেখেন, মড়া বয়ে নেয়া মেয়ে দুটির মুখে হাসি ফুটেছে; তাদের সঙ্গে একটি যুবক। সবাই বলাবলি করছে '–আশ্চর্য ক্ষমতা লোকটার। মরাকে বাঁচিয়ে দিলে? আশ্চর্য' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৫৮)। এই অবস্থা দেখে লেখক বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জীবনের অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে যুক্তিতর্কের ব্যাখ্যাও অবান্তর। তখন সবকিছু যেয়ে পৌঁছায় অলৌকিকতায়। আর এই অলৌকিকতার নিদর্শনই দেখালেন নন্দী-ক্ষ্যাপা!

'প্রমাণ' গল্পটিতে একজন ভদ্রবেশী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। জটা, গেরুয়া, প্রাণায়াম, আধ্যাত্মিক মার্গের এক পথিক শহর ছেড়ে গঙ্গার ধারে পোড়ো বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। প্রথমে তাকে সবাই ফেরারি আসামী, গোয়েন্দা মনে করেছিল। কিন্তু অনেকদিন পর সবার ধারণা হলো, লোকটি সন্ন্যাসী গোছের কিছু একটা হবে। এই ভেবে কেউ হাত দেখাতে, কেউ দৈব ঔষধ চাইতে আবার কেউ ভগবান সম্পর্কে কিছু জানতে চাইতে তার কাছে আসত। সবাইকে তিনি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে 'না' বলে দিতেন। কৌতূহলী জনতা বারবার হতাশ হয়ে ফিরে আসলেও হারাধনবাবু নামের এক ব্যক্তি হাল ছাড়লেন না। সময় পেলেই তাঁর কাছে যেয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। এ সময়টা তাঁর সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। তার সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও ভগবদ্ প্রসঙ্গে সাধারণ কথা হতো। কিছুদিন হারাধনবাবু সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া বন্ধ রাখেন তাঁর একমাত্র ছেলের টাইফয়েড হওয়ায়। অসুখ উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠায় মুমুর্ষূ ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তিনি সেই সাধুর

কাছে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। সাধুর জীবনের বিনিময়ে হারাধনের ছেলে সুস্থ হয়ে উঠে।

'অবর্তমান' গল্পটিতে কাহিনির ভেতর কাহিনির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ডাকবাংলোয় তিন শিকারির সামনে এক ভদ্রলোক নিজের শিকারি-জীবনের ভূতুড়ে অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। তাঁর তিনটি নেশা ছিল; ভ্রমণ, সংগীত এবং শিকার। এখানে এসে তিনি জানতে পারলেন গঙ্গার ধারে পাখি শিকারের সুবিধা রয়েছে। ফলে তিনি বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়েন– বিরাট বালুচর, মাঝে মধ্যে ঝাউ গাছের ঝোঁপ, একধারে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই, হুহু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া ছুটছে; এমন পরিবেশে চখার কাঁ আঁ শব্দ শুনে তিনি তার পিছু নেন। গঙ্গার ধারে মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় চতুর্দিক ভরে আছে। অনেকক্ষণ ঘুরে শেষে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে বসেন তিনি এবং বিগত ব্যর্থজীবনের স্মৃতিচারণ শুরু করেন। হঠাৎ আবার কাঁ আঁ শব্দ শুনতে পান এবং দেখেন চখাটা তাঁর মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার ফায়ারিং ঠিক লেগে যায় এবং চখাটা মরে পড়ে যায়। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে মাঝ গঙ্গায় যেয়ে পড়ে এবং পানির স্রোতে ভেসে যায়। এ সময় তিনি প্রকৃতির সন্ধ্যারূপে নিমগ্ন হয়ে যান। হঠাৎ চমকে ওঠেন এবং দেখতে পান দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গা মুছছে। লোকটি তাকে তার ছোট কুটিরে নিয়ে যায়। কুটিরটি যেন ছবির মতো – 'সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ – চতুর্দিকে রজনীগন্ধার গাছ – অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্ধ্বমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিক আচ্ছন্ন।' শিকারি কৌতূহল নিবারণ করতে না পেরে শেষে বলেই বসলেন, সারাদিন সে এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েও তার দেখা পেলো না কেন? লোকটি বলল, 'সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?' এ সময় তার চোখ যেন বাঘের চোখের মতো জ্বল জ্বল করছিল। সংগীতসাধক দীর্ঘকায় ব্যক্তিটি শিকারিকে তার জীবনের এক অদ্ভুত স্বপ্নময় অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করে – রামপ্রতাপ নামে দুই জমিদার ছিলেন; একজন সুদখোর অন্যজন সুরখোর। সুরখোরের বাড়িতে যত বিখ্যাত ওস্তাদের আড্ডা ছিল। তাকে গান শুনানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে রওনা হলো সে – বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে, চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ। আর কোথাও কিছু নেই। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ সাদা ধবধবে একটি প্রকাণ্ড রাজবাড়ি যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হয়। ধীরে ধীরে মিনার, মিনারেট, গম্বুজ, সিংহদ্বার সব গোচরীভূত হয়। আরো সামনে যেয়ে দেখে দুপাশে বিরাটকায় দারোয়ান, প্রজারা সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। তিনি ভিতরে ঢুকে পড়েন কারণ রাজা রামপ্রতাপকে গান শুনানো তার উদ্দেশ্য। কিছুদূর

যেয়ে ছোট একটি স্বপ্নের ছবির মতো বাগান দেখতে পায় দীর্ঘকায় লোকটি। বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারার উপরে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছেন রাজা রামপ্রতাপ, গড়গড়ার কুণ্ডলী পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চকমক্ করছে। রাজার কাছে যেয়ে সে কানাড়ার আলাপ শুরু করে দেয়; আলাপ চলছে তো চলছেই। হুঁশ হলে দেখে রাজা তাঁর গলায় এক ছড়া মুক্তার মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। গল্প বলা শেষ হলে সেই মালাটি সে কুটিরের ভিতর থেকে এনে তাকে (শিকারি লোকটিকে) দেখায়। আবার বলা শুরু করে – রাজা চলে যাবার পর সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলে দেখে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে সে শুয়ে আছে। শুধু তাই নয়, খোঁজ নিয়ে সে জানতে পায় গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হলো মারা গেছেন। বেঁচে আছেন শুধু সুদখোর রামপ্রতাপ আর সবাই তাকে সুদখোরের বাড়ির পথই দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর মনে একান্ত ইচ্ছা ছিল সুরখোর রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই মাঠের মাঝখানে তিনি দেখা দিয়ে গান শুনে বকশিস দিয়ে গেছেন। এরপর লোকটি শিকারিকে বাগেশ্রী আলাপ গেয়ে শোনায়। শিকারিও ছিলো সংগীতপিয়াসী। সে নিজে কখনো বাগেশ্রী আলাপ আয়ত্ত করতে পারেনি, তবে সাধ ছিল, তাই আজ শুনে নিলো। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে শিকারি। ঘুম থেকে উঠে তারও নদী থেকে হঠাৎ উঠে আসা লোকটির মতো অবস্থা হলো। সেও ঘুম থেকে উঠে দেখে ধু ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছে। কোথাও কেউ নেই। এক সময় সে উঠে বসে; দেখে চখাটা চরে বেড়াচ্ছে, মরেনি।

গল্প বলা শেষ হলে ভদ্রলোক পাশের ঘরে শুতে গেলেন। তিনজন শিকারি যারা উক্ত শিকারির গল্প শুনছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের অদম্য কৌতূহল হল গঙ্গার ঠিক কোন অঞ্চলে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটি জানবার। পাশের ঘরে ঢুকেই তিনি বিস্মিত হলেন, কারণ দেখলেন ঘরের ভিতর কেউ নেই। তখন চাপরাশির কাছ থেকে জানতে পারলেন – পাশের ঘরে কেউ নেই, গত দু সপ্তাহের মধ্যে এখানে কেউ আসেনি। চাপরাশির কথা শুনে ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন। তার মানে কি তারা এক ভূতের মুখে অন্য ভূতের গল্প শুনছিলেন? বনফুল এক ভূতের মুখে আরেক ভূতের গল্পকে এতটাই শিল্পসম্মত উপায়ে উপস্থাপন করেছেন যে গল্পটিকে অবিশ্বাস্য বলে মনেই হয় না। তাঁর কল্পনাশক্তি কতটা বাস্তবসম্মত হয়েছে তারই প্রমাণ 'অবর্তমান' গল্পটি।

'শেষ-কিস্তি' গল্পটি দৈব নিয়তির নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতাকে নিয়ে রচিত। দৈব শক্তির কাছে মানুষ কতটা অসহায় গল্পের চরিত্র জগৎ সেনের ট্রাজেডিই তার উদাহরণ। বিখ্যাত ধনী জগৎ সেনের ছেলের ম্যালিগনান্ট টাইপের টাইফয়েড হয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধ দীনু ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন সদ্য পাস করা ডাক্তার, গল্পকথক। কেবল এইটুকু ব্যবস্থাপনাতেই জগৎ

সেন সন্তুষ্ট নন। কোলকাতা থেকে দুজন ডাক্তার ও নার্স আনিয়েছেন, আশপাশের নাম করা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে মোটা মোটা ফি নিয়ে শেষে বিদায় নিলেন তাঁরা। দীনু ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কথক পাল্‌স রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর কিছু করলেন না। কারণ ওর সন্তানেরা বাঁচে না। প্রতি বছর একটা করে ছেলে জন্মায়, সাত আট বছর হতেই কিছু একটা হয় আর অমনি মরে যায়। এর আগে ছয়টা সন্তান মরেছে। গভীর রাতে কথক দেখেন, জগৎ সেন বিছানার একধারে চুপ করে বসে আছেন। তাঁর দিকে কটমট করে চেয়ে ছেলে বলে চলছে – 'ডাক্তারের একশ টাকা আর নার্সের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও না, আমি চলে যাই! কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও শিগগির, আমি আর থাকতে পারছি না – শিগগির দাও – শিগগির দিয়ে দাও' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৩৬)। এমন সময় জগৎ সেন হঠাৎ মাটিতে হাটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন – 'নবীনবাবু দয়া করুন আমাকে – আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি।... না, জোচ্চোরের বাড়ি আমি থাকি না' (সরোজমোহন ও নিরঞ্জন, ১৪০৫ : ৪৩৬) ডাক্তার আর নার্সের পাওনা চুকিয়ে দেয়ামাত্র রোগীটি তৃপ্ত হয়ে চিরতরে চোখ বুঁজল। জগৎ সেন নবীনবাবুর টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন বিধায় নবীনবাবুর প্রেতাত্মা আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতি, ডাক্তার ও নার্সদের সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে একে একে ছয়টি পুত্রের প্রাণ সংহার করে নিলেন। বনফুল স্বল্পভাষী লেখক তাই চরিত্রের ঘনঘটা, কাহিনির বিস্তার না ঘটিয়ে কেবল অলৌকিক শক্তির প্রভাবের প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি পূর্ণ গল্প রচনা করেছেন। বনফুলের রহস্যময় গল্পগুলো অদৃশ্যলোকের আলোয় ঝলকিত। যে অদৃশ্যলোকের হাতে মানুষ অসহায়। জাতিস্মরেও বনফুলের বিশ্বাসের কথা বলতে গিয়ে সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন – বনফুল নিজে একদিন রাতে তাঁর পূর্বজন্মের কোনো এক জায়গায় গিয়ে সবকিছু চিনতে পেরেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন রয়েছে তাঁর 'দুই তীরে' নামক অলৌকিক গল্পটিতে।

প্রকৃতপক্ষে বনফুল ছিলেন একজন সুস্থ জীবনশিল্পী। তাঁর গল্পগুলো মানবচরিত্রের শত দিকের শত অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। মানুষের জীবনের সব খুঁটিনাটি যা মুহূর্তের মধ্যে বুদবুদের মত মিলিয়ে যায় সেসব মুহূর্তকে তুলে ধরে তার মধ্যে সমগ্রতা দান করেন। তাঁর সৃজনী প্রবাহ কখনো সীমাবদ্ধ থাকেনি গতানুগতিকতায়; বিশেষত গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ সততই এক চরম দুঃসাহসের প্রমাণ দিয়েছে। অর্থাৎ তিনি নিজের চেতনায় ধরা চলমান জীবনের অজস্ররূপ প্রতিফলিত করেছেন নিজস্ব সৃষ্টির অবয়বে। বনফুল ব্যক্তিরূপের নানামাত্রিক অনন্যতা ও অসামান্যতা গাঢ় উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তিনি নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ শক্তিদ্বারা মানবজীবনের বিবিধ খণ্ডরূপকে পূর্ণতা দান করেছেন। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষকে দেখেছেন, তাদের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

মানবজীবনের যে দিকগুলো সাধারণত শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে ধরা পড়ে না; তাই বনফুলের গল্পে দেখা দিয়েছে। গল্পের ক্ষেত্রে অল্পকথন বা অতিকথন বর্জন তার বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্য কিংবা জীবনের একটি প্রদীপ্ত মুহূর্তকেই তিনি গল্পের বিষয় করে নিয়েছেন। মানবচরিত্রসৃষ্টিতে বনফুলের দক্ষতা ছিল সহজাত। তাঁর চরিত্রপ্রধান গল্পগুলোতে তিনি মানুষের স্বভাবের অন্তর্নিহিত দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে, নিজের মনের প্রতিফলনটুকু উহ্য রেখে। সমালোচকের মতে – জীবনের একটুখানি অংশমাত্র ছোটগল্পে দেখানো হয়, বনফুল এ সত্য মানেন। তাঁর বিষয়বস্তুকে তিনি নিজস্বদৃষ্টিতে দেখেন। তাই তাঁর গল্পে নিজস্বতার ছাপ গভীরভাবে মুদ্রিত।' (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়– "বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়", 'কালের প্রতিমা' ১৩১৮, পৃ-১০৮)।

কথাশিল্পী বনফুল ছিলেন বিশেষভাবে জীবন-সন্ধানী। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর কৌতূহলপূর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসা বিচিত্র মাত্রায় ছোটগল্পে নানামুখী আবেদন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যক্তিরূপের অসঙ্গতি, অসামান্যতা কখনো গাঢ়, কখনো উজ্জ্বল বর্ণে তাঁর ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়। তাই বনফুলের ভাষ্য – 'জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে পড়ে নানারকম মানুষ দেখেছি আমি। মানবজীবনের বৈচিত্র্যই আমাকে সবচেয়ে বেশী ইন্সপায়ার করে।' আরো স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন – 'মানুষই আমার বিষয় এবং প্রেরণা। আমার লেখায় একটি মেসেজ বা বলবার কথা আছে। সেটা হল মানুষ বহু বিচিত্র। মানুষকে অনুসরণ করে আমি আমার লেখার নিত্য নতুন বিষয় ও ভঙ্গি আবিষ্কার করেছি' (বনফুল, ১৯৯৭ : ১১৭)।

পেশায় চিকিৎসক হওয়ায় বনফুল অন্য অনেক লেখকের চেয়ে জীবনের নানা দিক সম্পর্কে বেশি অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্যলোকে এবং অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। অনেক দুর্জ্ঞেয় ও ব্যাখ্যাতীত বিষয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বলে পাঠককে জানিয়েছেন। বনফুল ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎ এবং সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের অনুভূতি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য তাঁর গল্পে যেভাবে উদঘাটিত হয়েছে তা দেশকালাতীত মানব-সত্তার পরিচয় বহন করে। বনফুল বাংলা ছোটগল্পের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সেরা গল্পকথক। লেখক-জীবনের সূচনাতেই নিজের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সেই প্রকাশ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী করে।

গ্রন্থপঞ্জি

পবিত্র সরকার সম্পাদিত (১৯৯৯)। *বনফুল : শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্মশতবর্ষ সমিতি, কলকাতা

প্রমথনাথ বিশী (১৪০৭)। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, একাদশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত (২০০০)। *বনফুল*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা

বনফুল (১৯৯৯), *পশ্চাৎপট*, বাণীশিল্প সংস্করণ, কলকাতা

উর্মী নন্দী (১৯৯৭)। বনফুল : *জীবন, মন ও সাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

নিশীথ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৮)। *বনফুল : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৪০৫)। *বনফুল : গল্পসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৪০৫)। *বনফুল : গল্পসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৪০৫)। *বনফুল : গল্পসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৪০৪)। *বনফুল : গল্পসমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৯৯৩)। *বনফুল রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা